CGIAR

INITIATIVE ON
Asian Mega-Deltas

স্বাস্থ্যকর্মী ও সম্প্রসারণ কর্মীদের

পুষ্টি শিক্ষা অধিবেশন পরিচালনা সহায়ক ফ্লিপচার্ট

WorldFish

CGIAR

স্বাস্থ্যকর্মী ও সম্প্রসারণ কর্মীদের পুষ্টি শিক্ষা অধিবেশন পরিচালনা সহায়ক ফ্লিপচার্ট

সম্পাদনায়

ছামিউল ইসলাম, ওয়ার্ল্ডফিশ বাংলাদেশ

হযরত আলী, ওয়ার্ল্ডফিশ বাংলাদেশ

কামরুন নাহার, ওয়ার্ল্ডফিশ বাংলাদেশ

ড. খন্দকার মোর্শেদে জাহান, ওয়ার্ল্ডফিশ বাংলাদেশ

প্রকাশনায়

সিকিউরিং দি ফুড সিস্টেমস অফ এশিয়ান মেগা-ডেল্টাস ফর ক্লাইমেট এন্ড লাইভলিহুড রেজিলিয়েন্স (এএমডি)

প্রচ্ছদ ডিজাইন ও ব্র্যান্ডিং

মোহাম্মদ সোহরাব হোসেন, ওয়ার্ল্ডফিশ বাংলাদেশ

ফটো ক্রেডিট

ফটো এজেন্সিজ/ওয়ার্ল্ডফিশ

প্রকাশকাল

ডিসেম্বর, ২০২৩

মুদ্রণে

কালার লাইন, মহাখালী

ফ্লিপচার্টের উদ্দেশ্য

এশিয়ান মেগা-ডেল্টাস ইনিশিয়েটিভের ওয়ার্ক প্যাকেজ-২ এর বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে বাংলাদেশের দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে মাছচাষি পরিবারের সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করে চাষি দল গঠন করা হয়েছে। উক্ত সদস্যের মাছচাষ থেকে আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও পরামর্শের পাশাপাশি পুষ্টি-সংবেদনশীল কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। চাষি দলে-এ পুষ্টি শিক্ষা অধিবেশন পরিচালনার জন্য সহায়ক উপকরণ হিসাবে এই ফ্লিপচার্টটি তৈরি করা হয়েছে। এই ফ্লিপচার্টটি মূলত স্বাস্থ্যকর্মী ও সম্প্রসারণ কর্মীরা পুষ্টি বিষয়ক অধিবেশন পরিচালনার জন্য ব্যবহার করবেন। সহায়ক উপকরণ হিসাবে এই ফ্লিপচার্টটির ব্যবহার উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর পুষ্টি বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি ও আচরণ পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ফ্লিপচার্ট ব্যবহারের নিয়মাবলী

- ফ্লিপচার্ট-টি ব্যবহারের আগে প্রতিটি পাতা খুব ভালোভাবে পড়ে ও দেখে নিন। কোন ছবি দেখিয়ে কী বলতে হবে তা বুঝে নিন।
- ফ্লিপচার্ট অংশগ্রহণকারীদের সামনাসামনি রাখুন যেন তারা স্পষ্টভাবে ছবিগুলো দেখতে পায়।
- উল্টোদিকের লেখাগুলো ফ্লিপচার্ট ব্যবহারকারীর দিকে রাখুন যেন সহজেই বক্তব্যগুলো দেখে অংশগ্রহণকারীদের কাছে বর্ণনা করতে পারে।
- ফ্লিপচার্টের বক্তব্যগুলো পড়ে শোনানোর চাইতে সঠিকভাবে, সহজ ও সাবলীলভাবে নিজের ভাষায় বোঝানো ভালো। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ফ্লিপচার্টের লেখাগুলো ব্যবহারকারীকে কী বলতে হবে তা মনে করিয়ে দেয়ার জন্য।
- অংশগ্রহণকারীদের গোল বা ইউ (U) আকারে বসার ব্যবস্থা করুন, যাতে প্রত্যেকে ফ্লিপচার্ট দেখতে পায় এবং আলোচনার সময়ে তারা একে অন্যকেও দেখতে পায়।
- সেশনের উদ্দেশ্যের প্রতি নজর রেখে আলোচনা শুরু করুন। সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট বিষয়ের ছবি দেখিয়ে সে সম্পর্কে ধারণা নিন। তারপর তাদের ধারণার সূত্র ধরেই আলোচনা শুরু করুন।
- সময়ের দিকে খেয়াল রেখে কখনও শুধু মূলবার্তা আবার কখনও বিস্তারিত আলোচনা করুন।
- অংশগ্রহণকারীদের প্রশ্ন করা, মতামত দেয়া কিংবা অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন যাতে আলোচনায় তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়। এখানে মনে রাখুন, আলোচনায় দুই পক্ষেরই অর্থাৎ অংশগ্রহণকারীদের ও আলোচনা পরিচালনাকারী উভয়েরই অংশগ্রহণের সুযোগ না থাকলে ফলপ্রসূ যোগাযোগ সম্ভব নয়।
- আলোচনা শেষে সারসংক্ষেপ করে আবার মূল বিষয়টি বলুন। অংশগ্রহণকারীদের মূল্যবান মতামত ও অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ দিয়ে পরবর্তী আলোচনার আমন্ত্রণ জানিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

ফ্লিপচার্টে বর্ণিত পুষ্টি শিক্ষা অধিবেশনসমূহ:

অধিবেশন-১ : খাদ্য, পুষ্টি ও বৈচিত্র্যময় খাবার

অধিবেশন-২ : অপুষ্টির কারণ, ফলাফল ও প্রতিরোধের উপায়

অধিবেশন-৩ : অনুপুষ্টি উপাদানের অভাবজনিত সমস্যা ও প্রতিরোধের উপায়

অধিবেশন-৪ : অপুষ্টি প্রতিরোধে ও পুষ্টি উন্নয়নে নবজাতক ও শিশুর খাবার ও যত্ন

অধিবেশন-৫ : গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী নারীর পুষ্টি ও যত্ন

অধিবেশন-৬ : শিশু ও নারীর পুষ্টিতে মাছ

অধিবেশন-৭ : হাত ধোয়া ও নিরাপদ খাদ্য

অধিবেশন-৮ : নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা

অধিবেশন-৯ : কিশোরীর পুষ্টি

অধিবেশন -১০ : বাল্যবিবাহ, এর কারণ, ফলাফল ও প্রতিরোধের উপায়

অধিবেশন-১১ : পুষ্টি উন্নয়নে পরিবার পরিকল্পনা সেবা গ্রহণ

অধিবেশন-১২ : পুষ্টি নিশ্চিতকরণে নারী-পুরুষের সমতায়ন

অধিবেশন-১ : খাদ্য, পুষ্টি ও বৈচিত্র্যময় সুষম খাবার

খাদ্য : খাদ্য হচ্ছে এমন কতগুলো প্রয়োজনীয় উপাদানের সমষ্টি যা গ্রহণের মাধ্যমে শরীরে তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে কর্মক্ষম রাখে, শরীরের বৃদ্ধি সাধন ও ক্ষয়পূরন করে, এবং সর্বোপরি শরীরে রোগ প্রতিরোধ বৃদ্ধি সৃষ্টি তৈরী করে।

পুষ্টি : পুষ্টি হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে গ্রহণ করা খাদ্য শোষিত হয়ে-

- শরীরে তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে
- শরীরের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধি সাধন করে
- শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি করে

কাজ অনুযায়ী খাদ্যের শ্রেণী বিভাগ :

- শক্তিদায়ক খাবার (শর্করা ও চর্বি জাতীয়) যেমন – ভাত, রুটি, মুড়ি, খই, আলু, গুড়, চিনি, পাউরুটি, সরিষার তেল/সয়াবিন তেল, ঘি, মাখন, মধু, নারকেল ইত্যাদি ও এসব থেকে তৈরি খাবার।
- শরীর বৃদ্ধি ও ক্ষয়পূরণকারী খাবার (আমিষ জাতীয়) যেমন- মাছ, মাংস, ডিম ও ডাল জাতীয় শস্য, শিমের বিচি, দুধ, বাদাম, কলিজা ইত্যাদি ও এসব থেকে তৈরি খাবার।
- রোগ প্রতিরোধকারী খাবার (ভিটামিন ও খনিজ লবণ সমৃদ্ধ) যেমন- রঙিন শাকসবজি, দেশী মৌসুমি ফল যেমন আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, আমলকি, কলা ইত্যাদি।

পরিবারে বৈচিত্র্যময় ও সুষম খাবারের সরবরাহ নিশ্চিত করার উপায়সমূহ :

- বসতবাড়িতে শাকসবজির বাগান করা
- মাছ চাষ, মাছ ধরা, মাছ শুঁটকি করা
- ক্ষুদ্র পরিসরে হাঁস-মুরগি পালন
- ভবিষ্যতের জন্য খাদ্য সংরক্ষণ
- মিশ্র ও সমন্বিত চাষাবাদ পদ্ধতির প্রবর্তন
- নতুন ধরনের ফসল চাষ
- জলবায়ু সহিষ্ণু পদ্ধতির সাথে খাপ খাওয়ানো।

শরীরের যথাযথ পুষ্টির জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত সুষম খাবার।
“তিনে মিলে এক হয় সুষম খাবার তারে কয়”

অধিবেশন-১: খাদ্য, পুষ্টি ও বৈচিত্র্যময় সুষম খাবার

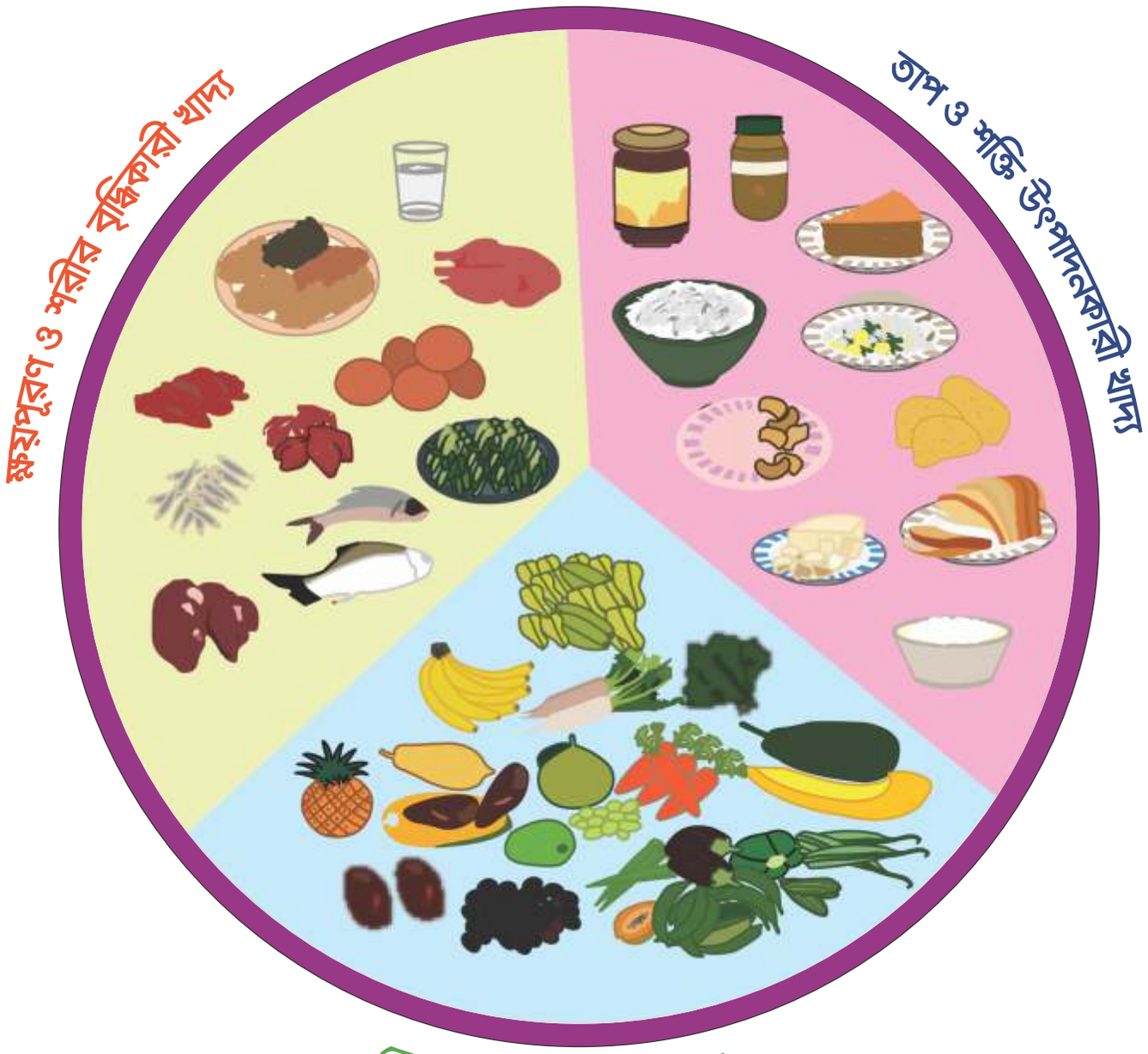

অধিবেশন-২ : অপুষ্টি, এর কারণ, ফলাফল ও প্রতিরোধের উপায়

অপুষ্টি এবং অপুষ্টির প্রকারভেদ: প্রয়োজনের তুলনায় অপর্যাপ্ত কিংবা অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণের ফলে এবং/অথবা রোগ সংক্রমণের ফলে দেহে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে অপুষ্টি বলে। অপুষ্টিকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয় যথা- কম পুষ্টি ও অতিপুষ্টি/স্থুলতা। কম পুষ্টি আবার তিন ধরনের-

কম ওজন : শিশুর ওজন যদি বয়সের তুলনায় কম হয় তাকে কম ওজন বলা হয়।
খর্বকায় : শিশুর উচ্চতা যদি বয়সের তুলনায় কম হয় তাকে খর্বকায়/বেটে বলা হয়।
কৃশকায় : শিশুর ওজন তার উচ্চতার তুলনায় কম হলে তাকে কৃশকায়/ক্ষীণকায় বলা হয়। শিশুর ওজন যদি উচ্চতার তুলনায় খুব কম হয় তখন মারাত্মক তীব্র অপুষ্টির সৃষ্টি হয়।

সেই সাথে বিভিন্ন অনুপুষ্টি উপাদান যেমন- ভিটামিন ও খনিজ লবণের অভাবেও কিছু অপুষ্টি দেখা যায় যেমন- আয়রনের অভাবে রক্তস্বল্পতা ইত্যাদি।

অপুষ্টির প্রধান কারণসমূহ	অপুষ্টির ফলাফল
▪ অপর্যাপ্ত/অতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ (পরিমাণ ও খাদ্য বৈচিত্র্য না মেনে চলা) ▪ অনুপুষ্টি উপাদানের অভাব ▪ শিশুকে মায়ের দুধ সঠিকভাবে না খাওয়ানো ▪ শিশুর বয়স অনুযায়ী (৬ মাসের পর থেকে) সঠিক পরিপূরক খাবার না খাওয়ানো ▪ গর্ভকালীন ও প্রসূতি মায়ের পর্যাপ্ত খাদ্য ও যত্নের অভাব ▪ অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্যসম্মত কার্যক্রম না মেনে চলা ও অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ ▪ ঘন ঘন অসুস্থতা, বিশেষ করে সংক্রামক রোগে ভোগা ▪ বাল্যবিবাহ ও অল্প বয়সে গর্ভধারণ, বারবার/ঘন ঘন গর্ভধারণ ▪ পর্যাপ্ত পুষ্টি জ্ঞানের অভাব।	▪ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকায় ঘন ঘন রোগে আক্রান্ত হয়, চিকিৎসা খরচ বাড়ে ▪ শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয় ▪ পড়ালেখায় ও কাজকর্মে মনোযোগ দেয়া যায় না ▪ দুর্বলতা ও ক্লান্তিজনিত কারণে বেশি কাজ করা যায় না, উৎপাদনশীলতা কমে যায় ▪ গর্ভকালীন সময়ে শিশুর দেহে প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহের সামর্থ্য থাকে না ▪ প্রসবকালীন সময়ে মায়ের জটিলতা এবং কম ওজনের শিশু জন্মদানের ঝুঁকি বেড়ে যায় ▪ দীর্ঘমেয়াদী অপুষ্টি সৃষ্টি হয় ও এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে অপুষ্টির চক্র চলতে থাকে।

অপুষ্টি প্রতিরোধ করার উপায় :

- নিয়মিত সুষম ও বৈচিত্র্যময় খাবার গ্রহণ করা
- নবজাতক ও শিশুদের সঠিক খাবার প্রদান ও যত্ন গ্রহণ
- নারীদের, বিশেষত কিশোরী, গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী নারীদের সঠিক খাবার প্রদান ও অন্যান্য যত্ন নিশ্চিত করা
- অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্যসম্মত কার্যক্রম মেনে চলা
- বাল্যবিবাহ না দেয়া ও অল্প বয়সে গর্ভধারণ না করা, প্রয়োজনে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করা।

শিশুর মারাত্মক তীব্র অপুষ্টি হলে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স/জেলা সদর হাসপাতাল/মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে হবে

অধিবেশন-২: অপুষ্টির কারণ, ফলাফল, ও প্রতিরোধের উপায়

শিশুদের বিভিন্ন ধরণের অপুষ্টি

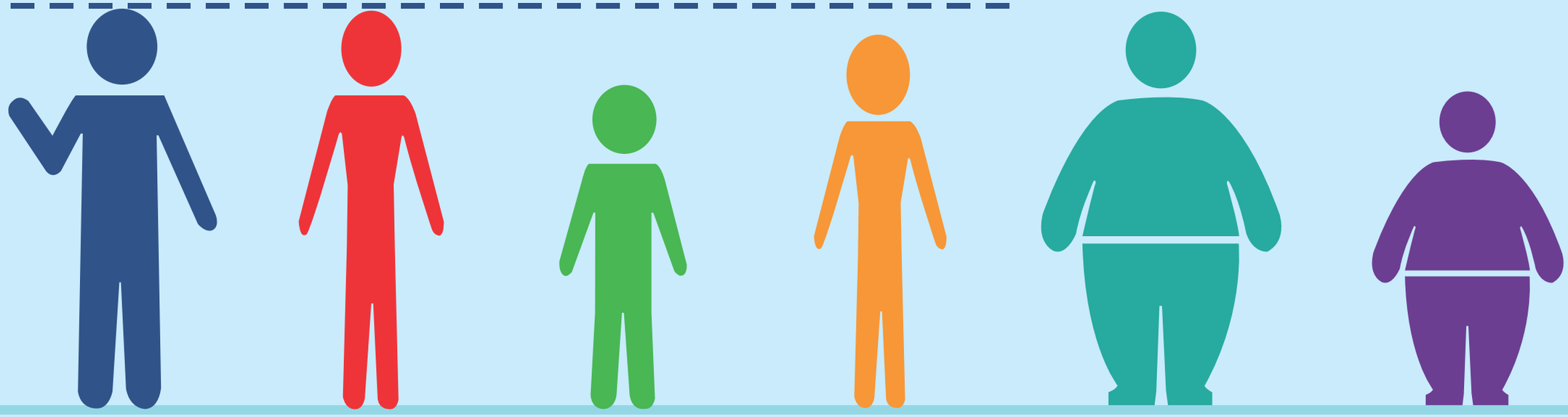

বয়স অনুযায়ী স্বাভাবিক উচ্চতা (স্বাভাবিক শিশু)	কৃশকায় (উচ্চতা অনুযায়ী ওজন কম)	খর্বকায় (বয়স অনুযায়ী উচ্চতা কম)	কম ওজন (বয়স অনুযায়ী ওজন কম)	স্থূলতা বা বেশি ওজন	অপুষ্টির দ্বৈত সমস্যা (খর্বকায় ও স্থূলকায়)

মারাত্মক তীব্র অপুষ্টি

খুব চিকন বা হাড্ডিসার এবং দুই পায়ে পানি আসা (অপুষ্টিজনিত)

অধিবেশন-৩: অনুপুষ্টি উপাদানের অভাবজনিত সমস্যা ও প্রতিরোধের উপায়

অনুপুষ্টি উপাদান : ভিটামিন ও খনিজ উপাদানসমূহ আমাদের শরীরে অতি সামান্য পরিমাণে প্রয়োজন তাই এদের অনুপুষ্টি উপাদান বলা হয়।

খাদ্যে অনেক ধরণের অনুপুষ্টি আছে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ভিটামিন এ, ভিটামিন বি (কমপ্লেক্স), ভিটামিন সি, ভিটামিন ডি, আয়রন, আয়োডিন, জিংক, ক্যালসিয়াম ইত্যাদি।

অনুপুষ্টি উপাদান	অভাবজনিত লক্ষণ	উত্তম খাদ্য উৎস
আয়রন (রক্তের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিমোগ্লোবিন তৈরির জন্য আয়রন অপরিহার্য)	– আয়রনের ঘাটতিজনিত রক্তস্বল্পতা – চোখের আবরণ, হাতের তালু, চেহারা, দাঁতের মাড়ি ও জিহবা ফ্যাকাশে হয় – নখ ভংগুর হয়, আপনা আপনি ভেঙ্গে যায়, এমনকি মধ্যাংশে কমে/দেবে যায় – নখের গোড়া/নখের সমস্যা হয় – বুক ধড়ফড় করে – অল্প পরিশ্রমে অধিক ক্লান্তি বোধ হয় এবং মেজাজ খিটখিটে থাকে – শিশুরা অস্থির চিত্ত হয়, পড়াশুনায় মনোযোগ কমে যায়	– মাংস, মাছ, কলিজা, ডিমের কুসুম, শুঁটকি মাছ ইত্যাদি। – কচু শাক, পুঁই শাক, লাল শাক, পালং শাক, সজিনা শাক, ধনিয়া পাতা, হেলেঞ্চা শাক, ডাল, খেজুর, কালোজাম, তরমুজ, পাকা তেঁতুল, গুড় ইত্যাদি। – ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাদ্য যেমন– লেবু, পেয়ারা, আমড়া, ইত্যাদি শরীরকে আয়রন গ্রহণে/শোষণে সহায়তা করে।
ক্যালসিয়াম (শরীরের প্রয়োজনীয় খনিজগুলোর মধ্যে অন্যতম)	– হাড় ও দাঁতের গঠন মজবুত হয় না – রক্ত জমাট বাঁধতে বাধাপ্রাপ্ত হয় – মায়ের দুধ উৎপাদন ব্যাহত হয় – বয়স্ক নারীদের হাড়ের ক্ষয় রোগ হয়	– দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার যেমন দই, পনির, মাখন, ক্ষীর, পায়েস ইত্যাদি। – কাঁটাসহ ছোট মাছ বা মাছের পাউডার। – কচু পাতা, ঢেঁড়স, ডাঁটা, মিষ্টি আলুর পাতা ইত্যাদি।
ভিটামিন সি (একটি শক্তিশালী ভিটামিন, যা দেহকে ক্ষতিকর পদার্থ থেকে রক্ষা করে)	– জিহবায় ঘা বা ছোট ছোট ক্ষত, দুর্বলতা, ক্লান্তিবোধ ও হাত-পায়ের পেশীতে ব্যথা, দাঁতের মাড়ির রোগ, রক্তস্বল্পতা, চুলের পরিবর্তন, ত্বক খসখসে হওয়া, লাল বিন্দুর মত ফুসকুড়ি, ত্বক থেকে রক্তপাত হতে পারে।	– আমলকি, পেয়ারা, আমড়া, লেবু, কমলা, মালটা, জাম, আনারস, কাঁচা পেঁপে, কাঁচা আম ইত্যাদি। – কাঁচা মরিচ, কাকরোল, করলা, সজনে পাতা, পালং শাক, বাধা কপি, ব্রোকলি, পুদিনা পাতা ইত্যাদি।

পরিমাণে কম লাগলেও অনুপুষ্টি উপাদানগুলো এতই গুরুত্বপূর্ণ যে নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্রহণ করা না হলে একজন মানুষ অসুস্থ অথবা শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধী হতে পারে

অধিবেশন–৩ : অনুপুষ্টি উপাদানের অভাবজনিত সমস্যা ও প্রতিরোধের উপায়

আয়রন ঘাটতিজনিত রক্তস্বল্পতা

আয়রন ঘাটতিজনিত রক্তস্বল্পতা যাদের বেশি হয়

রক্তস্বল্পতাজনিত দুর্বলতা ও ক্লান্তিবোধ

চোখ দেখে রক্তস্বল্পতা নির্ণয়

আয়রন সমৃদ্ধ খাবার

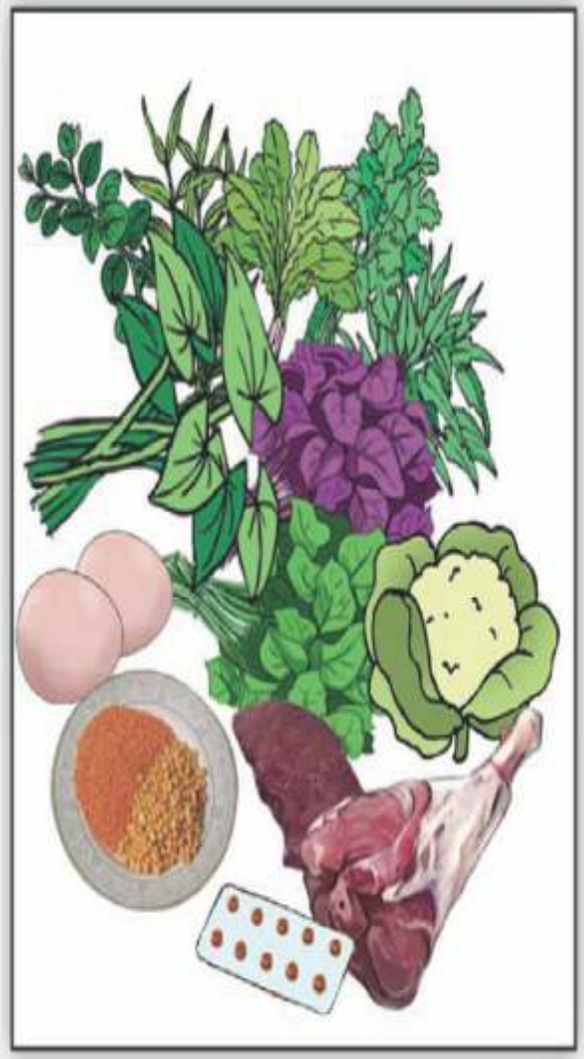

অধিবেশন-৩ : অনুপুষ্টি উপাদানের অভাবজনিত সমস্যা ও প্রতিরোধের উপায়

অনুপুষ্টি উপাদান	অভাবজনিত লক্ষণ	উত্তম খাদ্য উৎস
ভিটামিন এ (অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন)	– দৃষ্টিশক্তি ও চোখের অন্যান্য সমস্যা যেমন– রাতকানা, চোখের সাদা বা কালো অংশে ঘা বা স্থায়ী দাগ ইত্যাদি – ত্বকের সমস্যা (রুক্ষ ত্বক) – পেটের দীর্ঘমেয়াদী অসুখ (পাতলা পায়খানা) – হাম ও শ্বাসনালীর সংক্রমণ – রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পায়, ঘন ঘন অসুস্থ হয় – দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়	– শিশুর জন্য শালদুধসহ মায়ের দুধ খাওয়ানো – গাঢ় সবুজ ও হলুদ রঙের শাকসবজি যেমন–গাজর, মিষ্টি কুমড়া, পুঁইশাক, লাল শাক, কলমি শাক, সজনে শাক, মিষ্টি আলু ও মিষ্টি আলু শাক ইত্যাদি – হলুদ রঙের ফলমূল যেমন–পাকা পেঁপে, পাকা আম ইত্যাদি – কলিজা, ছোট মাছ, মাছের তেল, ডিমের কুসুম, মাখন, ঘি ইত্যাদি – ভিটামিন–এ সমৃদ্ধ তেল
আয়োডিন (আয়োডিন হচ্ছে এক প্রকার প্রাকৃতিক খনিজ উপাদান)	– গলগন্ড বা ঘ্যাগ হয় – স্বাভাবিক বুদ্ধি বিকাশে বাধা দেয় – মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধিতা যেমন: অল্প বুদ্ধিমান, বোবা, কালা, ট্যারা, খর্বকায় ইত্যাদি – গর্ভপাত ও মৃত শিশু প্রসব অথবা শিশু মৃত্যুও হতে পারে	– সামুদ্রিক মাছ, সমুদ্র উপকূলবর্তী শাকসবজি, সামুদ্রিক শৈবাল ইত্যাদি – আয়োডিনযুক্ত লবণ – এছাড়া, গৃহপালিত পশু পাখিকেও আয়োডিনযুক্ত লবণ খাওয়ালে এদের থেকে প্রাপ্ত মাংস, দুধ, ডিম–এ কিছু আয়োডিন পাওয়া যাবে
ভিটামিন বি কমপ্লেক্স (কোষের অভ্যন্তরীন ক্রিয়া–বিক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে)	– ভিটামিন বি১ এর অভাবে বেরিবেরি রোগ হয় যার লক্ষণগুলো হলো শারীরিক দুর্বলতা অনুভব করা, পা ভারী হয়ে যাওয়া, হাত–পা অবশ আর ঝিনঝিন বোধ করা, শরীর ফুলে যাওয়া – ভিটামিন বি২ এর অভাবে ঠোঁটের কিনারা ও জিহবায় ঘা হয় – ভিটামিন বি৩ এর অভাবে ত্বকের প্রদাহ, ডায়রিয়া ও মুখে ঘা – ভিটামিন বি৫ এর অভাবে হাত–পায়ে ঝিঁঝিঁ ধরে – ভিটামিন বি৬ এর অভাবে রক্তস্বল্পতা হয়	– ভিটামিন বি১ এর উৎসঃ আঁশযুক্ত চাল, কলিজা, ডিম, মাংস, মাছ, দুধ এবং শিম, বিচি জাতীয় খাবার, বাদাম, পালংশাক ইত্যাদি – ভিটামিন বি২ এর উৎসঃ দুগ্ধজাত খাদ্য, কলা, ডিম, শিম, বাদাম, মিষ্টি কুমড়া ইত্যাদি – ভিটামিন বি৩, বি৫, বি৬, বি৭–এর উৎসঃ মাংস, মাছ, ডিম, বাদাম, কাঠ বাদাম, গাছ বাদাম, কলা, কলিজা, পিয়াঁজ, গাজর, টমেটো ইত্যাদি

অনুপুষ্টি, যেমন– ভিটামিন ও খনিজ উপাদানের অভাবজনিত সমস্যা প্রতিরোধে আমাদের সব ধরনের খাবার নিয়মিত খেতে হবে

অধিবেশন–৩ : অনুপুষ্টি উপাদানের অভাবজনিত সমস্যা ও প্রতিরোধের উপায়

ভিটামিন ‘এ’ -র অভাবজনিত চোখের সমস্যা

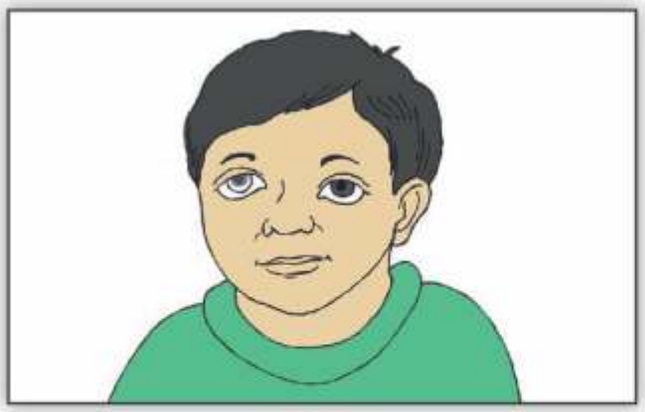

রাতকানা

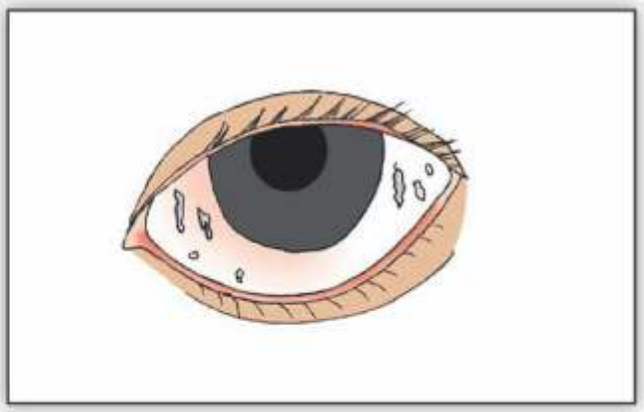

চোখের সাদা অংশে দাগ

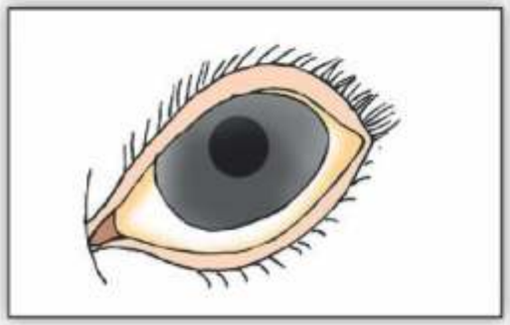

কর্নিয়ার শুষ্কতা

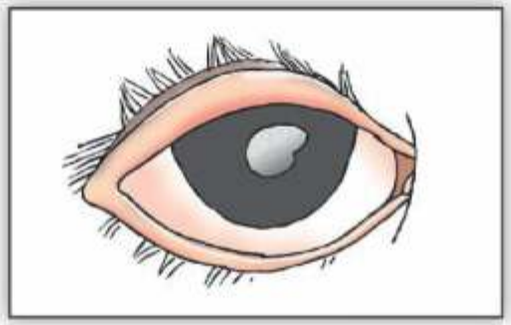

কর্নিয়ার ঘায়ের স্থায়ী দাগ

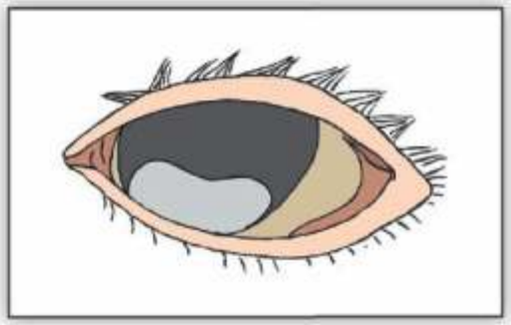

কর্নিয়ার ঘা

ভিটামিন এ সমৃদ্ধ খাবার

আয়োডিনের অভাবজনিত রোগ

শারীরিক প্রতিবন্ধিতা-খর্বকায়

মানসিক প্রতিবন্ধিতা
অল্প বুদ্ধিমান

গলগন্ড রোগ

অধিবেশন-৪ : অপুষ্টি প্রতিরোধে বা পুষ্টি উন্নয়নে নবজাতক ও শিশুর খাবার ও যত্ন

অপুষ্টি প্রতিরোধে নবজাতক ও শিশুর পুষ্টি বিষয়ক সুপারিশসমূহ :

- জন্মের সাথে সাথে (১ ঘন্টার মধ্যে) শিশুকে শালদুধ খাওয়ানো
- জন্মের পর থেকে পূর্ণ ৬ মাস (১৮০ দিন) পর্যন্ত শিশুকে শুধু মায়ের দুধ খাওয়ানো
- শিশুর বয়স ৬ মাস পূর্ণ হলে অর্থাৎ ১৮১তম দিন থেকে মায়ের দুধের পাশাপাশি ঘরে তৈরি বাড়তি খাবার খাওয়ানো শুরু করা
- শিশুকে ৬ মাস থেকে ২ বছর পর্যন্ত নিয়ম অনুযায়ী ঘরে তৈরি বাড়তি খাবার খাওয়ানো এবং এর পাশাপাশি মায়ের দুধ খাওয়ানো অবশ্যই চালিয়ে যাওয়া।

শিশুর জন্য মায়ের দুধ :

মায়ের দুধ শিশুর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাবার। শিশু জন্মের পর পরই শিশুকে অবশ্যই শালদুধ খাওয়াতে হবে। শালদুধের অনেক গুণাগুণ আছে। যেমন-

- শালদুধ শিশুর শরীরে প্রথম টিকা হিসেবে কাজ করে। এতে ভিটামিন-এ সহ অন্যান্য রোগ প্রতিরোধকারী উপাদান আছে, যা শিশুকে বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষা করে
- শালদুধ সহজে হজম হয়, নবজাতকের প্রথম কালো পায়খানা বের হতে সাহায্য করে
- শালদুধ খেলে নবজাতকের জন্ডিসের সম্ভাবনা কম হয়
- নবজাতক শালদুধ খেলে মায়ের জরায়ু সংকুচিত হয় এবং দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

মায়ের দুধের উপকারিতা অনেক, যেগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- শিশুর উপকার, মায়ের উপকার ও পরিবারের উপকার । (অংশগ্রহণকারীদের কাছে বিভিন্ন ধরনের উপকারের কথা শুনুন এবং প্রয়োজনে যোগ করুন)

একটি স্তনের দুধ খাওয়ানো শেষ করে তারপর অন্যটি শুরু করতে হবে। এতে যদি অন্য স্তনটি থেকে দুধ পড়েও যায়, তারপরও স্তন পরিবর্তন করা যাবে না। কারণ, শেষদিকে যে দুধ আসে তাতে পুষ্টি উপাদানের ঘনত্ব বেশি পরিমাণে থাকে।

কোনো অবস্থাতেই শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানো বন্ধ করা যাবে না। শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর সময় অসুবিধা হলে বা কোনো উপসর্গ দেখা গেলে স্বাস্থ্য কর্মীর পরামর্শ ও চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে হবে।

জন্মের সাথে সাথে (১ ঘন্টার মধ্যে) শিশুকে শালদুধ এবং প্রথম ছয় মাস শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ান

অধিবেশন-৪ : অপুষ্টি প্রতিরোধে বা পুষ্টি উন্নয়নে নবজাতক ও শিশুর খাবার ও যত্ন

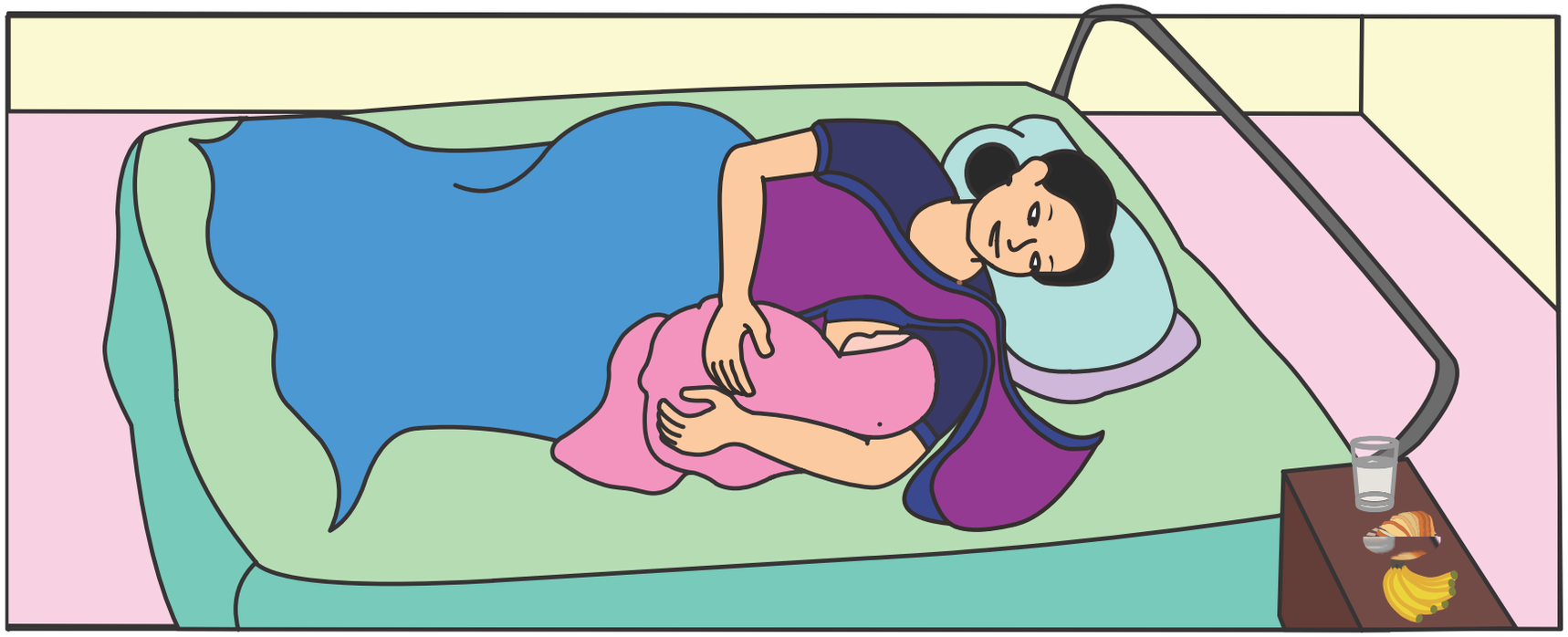

জন্মের পরপরই শালদুধ খাওয়ানো

কোনটাই দেয়া যাবে না

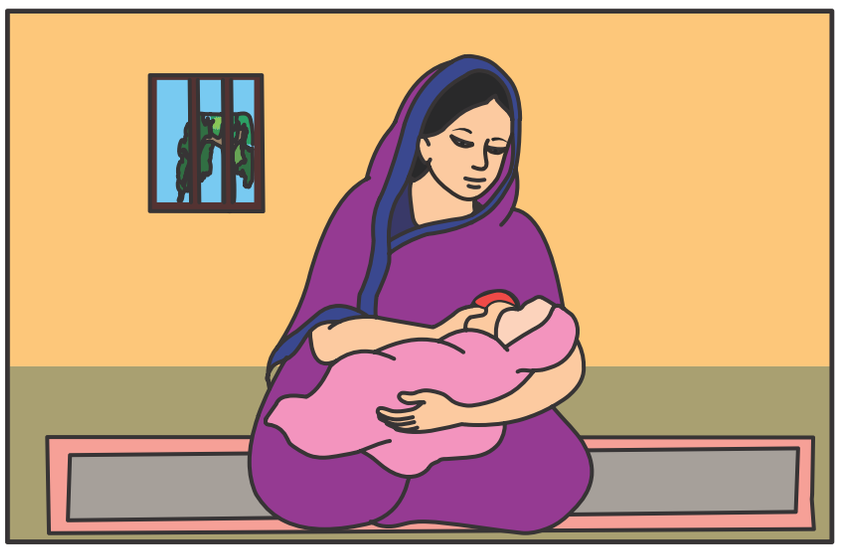

বসে দুধ খাওয়ানো

শুয়ে দুধ খাওয়ানো

সুস্থ সবল শিশু

৬-২৩ মাস বয়সী শিশুর পরিপূরক খাবার:

শিশুর বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার পুষ্টি চাহিদাও বেড়ে যায়, তাই ৬ মাসের পর থেকে অর্থাৎ ১৮১ দিন থেকে শিশুকে মায়ের দুধের পাশাপাশি ঘরে তৈরি পরিপূরক খাবার নিয়ম অনুযায়ী দিতে হবে। শিশুদের বাড়তি খাবারের উপকারিতা-

- মায়ের দুধের পাশাপাশি পরিপূরক খাবার দেয়া শুরু করলে শিশুর প্রয়োজনীয় পুষ্টি নিশ্চিত হয়
- শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ ভালো হয়
- পরিপূরক খাবার সঠিক নিয়মে খেলে শিশুর অসুখ কম হয় এবং সাধারণ অসুখ থেকে তাড়াতাড়ি সেরে উঠে
- পরবর্তীতে একজন সুস্থ ও পুষ্ট শিশু ও কিশোর/কিশোরীতে পরিণত হয়।

শিশুদের পরিপূরক ও বাড়তি খাবার খাওয়ানোর সুপারিশসমূহ :

শিশুদের পুষ্টির চাহিদা পূরণের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা শিশুদের বাড়তি খাবার খাওয়ানোর উপর কিছু সুপারিশমালা প্রণয়ন করেছে। নির্দিষ্ট বয়সভেদে খাবারের পরিমাণ ও বার এবং অন্যান্য সুপারিশগুলো হলো-

- **বিভিন্ন ধরনের খাবার-** বিভিন্ন ধরনের পারিবারিক খাবার থেকে শিশুর জন্য বাড়তি খাবার তৈরি করতে হবে। সে সাথে ঘাটতি পূরণের জন্য ভিটামিন 'এ' এবং 'আয়রন' সমৃদ্ধ খাবার খাওয়াতে হবে
- **খাবারের ঘনত্ব-** শিশু বড় হয়ে উঠার সাথে সাথে তার চাহিদা অনুযায়ী খাবারের ঘনত্ব বাড়াতে হবে
- **খাবারের পরিমাণ-** ৬ মাসের পর থেকে শিশু খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে, তাই তার খাবারের পরিমাণও সেভাবে বাড়াতে হবে
- **খাবারের বার-** শিশুর বেড়ে উঠার সাথে সাথে যেহেতু তার খাবারের পরিমাণও বাড়বে, সেজন্য সে খাবারটুকু তাকে সঠিক নিয়মে বারে বারে দিতে হবে । যেমন-

৬-৮ মাস বয়সী শিশুর বাড়তি খাবার	৯-১১ মাস বয়সী শিশুর বাড়তি খাবার	১২-২৩ মাস বয়সী শিশুর বাড়তি খাবার
প্রতিবারে ২৫০ মিঃ লিঃ/১ পোয়া বাটির আধা বাটি পরিমাণ খাবার দিনে কমপক্ষে দুইবার, সাথে ১-২ বার পুষ্টিকর নাস্তা	প্রতিবারে ২৫০ মিঃ লিঃ/১ পোয়া বাটির আধা বাটি পরিমাণ খাবার দিনে কমপক্ষে তিনবার, সাথে ১-২ বার পুষ্টিকর নাস্তা	প্রতিবারে ২৫০ মিঃ লিঃ/১ পোয়া বাটির পুরা বাটি পরিমাণ খাবার দিনে কমপক্ষে তিনবার, সাথে ১-২ বার পুষ্টিকর নাস্তা

শিশুকে সময় নিয়ে ধৈর্য্য ধরে খাওয়াতে হবে আর বাইরের খাবার, যেমন চিপস, চানাচুর, বিস্কুট, চকলেট, আচার ইত্যাদি খাবার দেয়া যাবে না। মনে রাখতে হবে, শিশুর পেট অনেক ছোট, তাই বাইরের খাবার না দিয়ে ঘরে তৈরি পারিবারিক খাবারগুলো থেকে একটু করে নিয়ে শিশুর উপযোগী করে খাওয়াতে হবে।

শিশুর পুষ্টি চাহিদা পূরণে ৬ মাস বয়সের পর থেকে, অর্থাৎ ১৮১ দিন থেকে, শিশুকে মায়ের দুধের পাশাপাশি ঘরে তৈরি পরিপূরক খাবার নিয়ম অনুযায়ী খাওয়াতে হবে

৬–২৩ মাস বয়সী শিশুর পরিপূরক খাবার

৬-৮ মাস বয়সী শিশুর খাবার

৯-১১ মাস বয়সী শিশুর খাবার

১২-১৩ মাস পূর্ণ বয়সী শিশুর খাবার

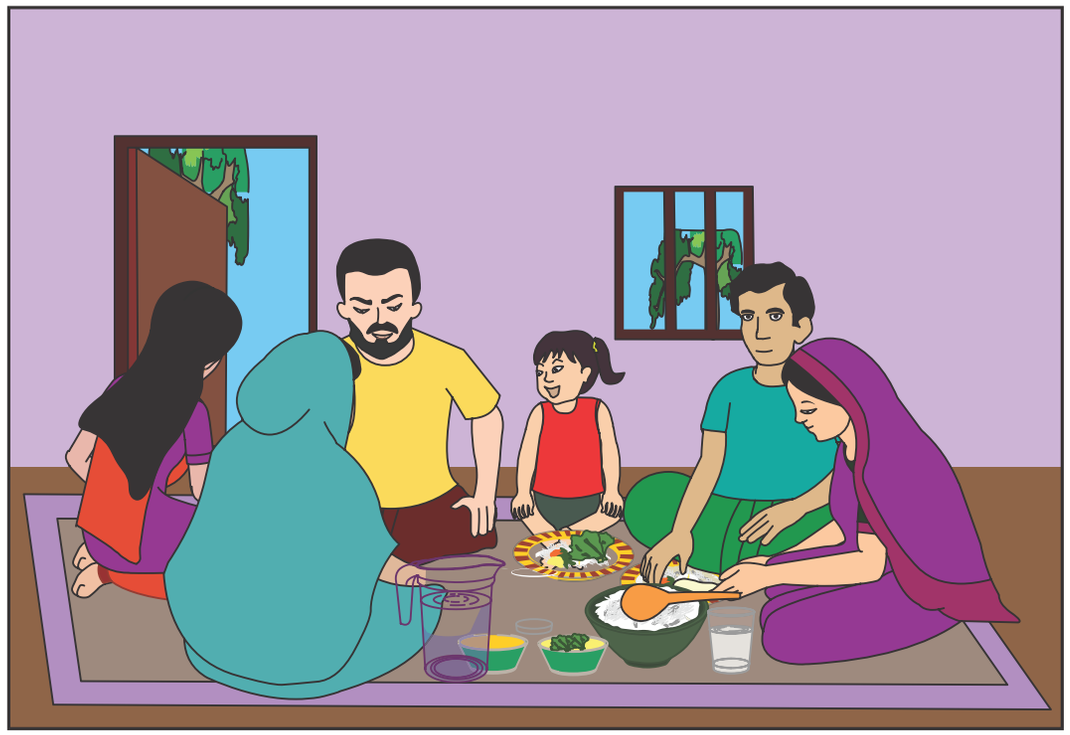

পারিবারিক পরিবেশে শিশুকে খাওয়ানো

শিশুর খাদ্য বৈচিত্র্য :

পুষ্টি চাহিদা পূরণ এবং সঠিক শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশের জন্য শিশুকে বিভিন্ন ধরনের খাবার নিয়মিত খাওয়ানোই হলো শিশুর খাদ্য বৈচিত্র্য। খাদ্য বৈচিত্র্য শিশুর বিকাশের অন্যতম প্রধান পর্যায়, তাকে নতুন নতুন স্বাদ, গন্ধ, রঙ এবং খাওয়ার আনন্দের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে।

- শিশুর জন্য ৮ ধরনের খাবার থেকে প্রতিদিন কমপক্ষে ৫ ধরনের খাবার খেতে দিতে হবে
- শিশুকে প্রতিদিন একটি প্রাণিজ খাবার যেমন মাছ, মাংস, ডিমের যেকোন একটি খেতে দিতে হবে
- পুষ্টিকর নাস্তা হিসেবে পাকা পেঁপে বা অন্যান্য ফল, মিষ্টি কুমড়া ভাজি, ডিম বা দুধ দিয়ে তৈরি নাস্তা দেয়া দরকার
- বিভিন্ন ধরনের খাবারের সঠিক সংমিশ্রণ খাবারে বিদ্যমান পুষ্টি উপাদানের শোষণে সহায়তা করে
- প্রতিদিনই খাবারের তালিকায় বৈচিত্র্য থাকতে হবে, যাতে শিশু একই ধরনের খাদ্য গ্রহণে বিরক্ত না হয়। সব ধরনের খাবার থেকে বা বৈচিত্র্যময় খাবার দিতে হবে।

শিশুর জন্য ৮ ধরনের খাবার নিম্নরূপ :

খাদ্যের ধরন	উদাহরণ
১) মায়ের দুধ	মায়ের দুধ (মায়ের দুধের বিকল্প কিছু নাই)
২) শস্য ও মূল জাতীয় খাবার	ভাত, রুটি, পাউরুটি, কেক, বিস্কুট, নুডলস, মুড়ি, আলু, মিষ্টি আলু ইত্যাদি
৩) প্রাণিজ খাবার	সব ধরনের ছোট ও বড় মাছ এবং সব ধরনের মাংস ও বিভিন্ন প্রাণির কলিজা ইত্যাদি
৪) ডাল, বাদাম ও বিচি জাতীয় খাবার	বিভিন্ন ধরনের ডাল (মসুর, মুগ, ছোলা), সিম ও বিচি জাতীয় খাবার, চিনা বাদাম, পেস্তা বাদাম, কাঠ বাদাম ইত্যাদি
৫) দুধ বা দুধের তৈরি খাবার	দুধ, দই, ঘি, মাখন, পনির, পায়েশ, সেমাই, মিষ্টি, সন্দেশ ইত্যাদি
৬) ডিম ও ডিমের তৈরি খাবার	হাসঁ-মুরগির ডিম, কোয়েল পাখির ডিম ও ডিমের তৈরি খাবার, পুডিং, হালুয়া ইত্যাদি
৭) রঙিন ও গাঢ় সবুজ শাকসবজি ও মৌসুমি ফল	গাঢ় সবুজ ও হলুদ রঙের শাকসবজি (পুঁইশাক, পালংশাক, কলমী শাক, লাল শাক, গাজর, মিষ্টি আলু, মিষ্টি কুমড়া, টমেটো ইত্যাদি) এবং ফলমূল (পাকা পেঁপে, পাকা আম, কাঁঠাল, তরমুজ, তাল, খেঁজুর, কলা ইত্যাদি)
৮) অন্যান্য শাকসবজি ও মৌসুমি ফল	লাউ, ঝিংগা, চিচিঙ্গা, ঢেঁড়স, কাঁচা কলা, ডাটা, মুলা শাক, আমলকি, পেয়ারা, আমড়া, জলপাই, আনারস ইত্যাদি

শিশুর সঠিক শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশের জন্য মায়ের দুধের পাশাপাশি নিয়ম মেনে বৈচিত্র্যময় (৮ ধরনের থেকে একটি প্রাণিজ খাবারসহ কমপক্ষে ৫ ধরনের) খাবার খাওয়াতে হবে

শিশুর প্রতিদিনের ৮ ধরনের খাদ্য তালিকা

Adapted from Suchana, Save the Children

অধিবেশন-৫: গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী নারীর পুষ্টি ও যত্ন

নারীর জন্য বৈচিত্র্যময় খাবার : নারীর পুষ্টি চাহিদা পূরণের জন্য এবং সুস্থ-সবল ও মেধাবী শিশু পেতে হলে গর্ভবতী ও প্রসূতি নারীদের যথাযথ বৈচিত্র্যময় খাবার ও যত্নের ব্যবস্থা রাখতে হবে। খাদ্য বৈচিত্র্য নিশ্চিত করতে, গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারীসহ সকল নারীকে প্রতিদিন ১০ ধরনের খাবার থেকে কমপক্ষে ৫ ধরনের খাবার খেতে হয়।

নারীর পুষ্টিতে ১০ ধরনের খাবার-

১) ভাত, আলু, রুটি, কেক, বিস্কুট ও নুডলস জাতীয় খাবার
২) সব ধরনের ডাল বা ডাল জাতীয় খাবার
৩) বিচি ও বাদাম জাতীয় খাবার
৪) দুধ বা দুধ দিয়ে তৈরি খাবার
৫) প্রাণিজ খাবার যেমন সব ধরনের মাছ, মাংস ইত্যাদি
৬) ডিম ও ডিমের তৈরি খাবার
৭) রঙিন ও গাঢ় সবুজ শাকসবজি (ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ)
৮) হলুদ বা কমলা রঙের শাঁসযুক্ত মৌসুমি ফল (ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ)
৯) অন্যান্য শাকসবজি
১০) অন্যান্য ফল।

গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী নারীর যত্নের সুপারিশ-

- গর্ভাবস্থায় প্রতিবেলার স্বাভাবিক খাবারের সাথে কমপক্ষে ১ মুঠো ও প্রসূতিকালীন ২ মুঠো খাবার বেশি খেতে হবে। একবারে খেতে না পারলে অল্প অল্প করে বারে বারে খেতে হবে। পুষ্টি চাহিদা পূরণে বেশি বেশি করে খেতে হবে
- গর্ভকালীন ও প্রসূতিকালীন সময় বৈচিত্র্যময় খাদ্যের গুরুত্ব অনেক বেশি। মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, কলিজা, ঘন ডাল, রঙিন ও গাঢ় সবুজ শাকসবজি, দেশীয় মৌসুমি ফলমূল এবং ঘরে তৈরি নাস্তা খেতে হবে
- খাবার তৈরির সময় আয়োডিনযুক্ত লবণ ও ভিটামিন-এ যুক্ত তেল ব্যবহার করতে হবে
- চিকিৎসক/প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ অনুযায়ী রক্তস্বল্পতা প্রতিরোধে গর্ভাবস্থায় প্রতিদিন ১টি করে আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট খেতে হবে এবং সন্তান জন্মদানের পরও তিনমাস পর্যন্ত প্রতিদিন ১টি করে আয়রন ফলিক এসিড ট্যাবলেট খেতে হবে
- গর্ভাবস্থায় যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্রাম নিতে হবে। একজন গর্ভবতী নারীর দুপুরে ২ ঘন্টা বিশ্রাম ও রাতে কমপক্ষে ৮ ঘন্টার ঘুম প্রয়োজন
- গর্ভাবস্থায় ভারী কাজ (যেমন টিউবওয়েল চাপা, ধান ভানা, ভারী জিনিস তোলা, অতিরিক্ত কাপড় ধোয়া এবং কষ্টকর পরিশ্রম) থেকে বিরত থাকতে হবে
- দুগ্ধদানকারী মাকে গৃহস্থালি কাজে সহায়তা করতে হবে। যাতে মা শিশুকে সময় নিয়ে সঠিকভাবে বার বার দুধ খাওয়াতে পারে।

খাদ্য বৈচিত্র্য নিশ্চিত করতে গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারীসহ সকল নারীকে প্রতিদিন ১০ ধরনের খাবার থেকে কমপক্ষে ৫ ধরনের খাবার খেতে হয়

অধিবেশন-৫ : গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী নারীর পুষ্টি ও যত্ন

নারীর ১০ ধরনের খাবারের তালিকা

০১ ভাত, আলু, রুটি জাতীয় খাবার

০২ ডাল জাতীয় খাবার

০৩ বিচি ও বাদাম জাতীয় খাবার

০৪ দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার

০৫ প্রাণিজ খাবার

০৬ ডিম ও ডিমের তৈরি খাবার

০৭ গাঢ় রঙের শাকসবজি

০৮ ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ খাবার

০৯ অন্যান্য সবজি

১০ অন্যান্য ফলমূল

মা ও পরিচর্যাকারী

বিশ্রাম

ভারী কাজ না করা

Adapted from Suchana, Save the Children

গর্ভকালীন ও প্রসব পরবর্তী স্বাস্থ্য পরীক্ষা বা চেকআপ -এর সময়:

গর্ভকালীন স্বাস্থ্য পরীক্ষা: গর্ভাবস্থায় কমপক্ষে চারবার গর্ভকালীন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে। এসব স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় সাধারণত মায়ের পুষ্টি অবস্থা, ওজন, রক্তস্বল্পতা, রক্তচাপ, গর্ভে শিশুর অবস্থান পরীক্ষা করা হয় এবং প্রয়োজনীয় কিছু ঔষধ ও টিটি টিকা দেওয়া হয়।

প্রসব-পরবর্তী স্বাস্থ্য পরীক্ষা: একজন গর্ভবতীকে যেমন তার গর্ভকালীন সময়ে কমপক্ষে ৪ বার চেকআপ করাতে হয়, তেমনই একজন প্রসূতি মাকেও তার প্রসব-পরবর্তীকালে প্রসবজনিত জটিলতা পরিহারের জন্য কমপক্ষে ৪ বার চেকআপ করাতে হবে।

চেকআপ	গর্ভকালীন স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময়	প্রসব পরবর্তী স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময়
১ম চেকআপ	১৬ সপ্তাহ (৪ মাস)	প্রসবের ২৪ ঘন্টার মধ্যে
২য় চেকআপ	২৪-২৮ সপ্তাহ (৬-৭ মাস)	প্রসবের ২-৩ দিনের মধ্যে
৩য় চেকআপ	৩২ সপ্তাহ (৮ মাস)	প্রসবের ৭-১৪ দিনের মধ্যে
৪র্থ চেকআপ	৩৬ সপ্তাহ (৯ মাস)	প্রসবের ৪২ দিনের মধ্যে

এছাড়াও কোনো সমস্যা হলে বা বিপদচিহ্ন দেখা দিলে, দ্রুত হাসপাতাল বা স্বাস্থ্যকর্মীর সাথে যোগাযোগ করতে হবে। গর্ভাবস্থায় এবং প্রসব পরবর্তীতে একজন নারীর যে কোনো সময়ে যে কোনো ধরনের বিপদ দেখা দিতে পারে। তাই গর্ভবতীসহ পরিবারের সবার এসব বিপদচিহ্ন সম্পর্কে জেনে রাখতে হবে।

গর্ভকালীন ৫টি বিপদচিহ্ন	প্রসব-পরবর্তী ৪টি বিপদচিহ্ন
১. রক্তক্ষরণ	১. অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ
২. প্রচন্ড জ্বর	২. প্রচন্ড জ্বর
৩. তীব্র মাথা ব্যথা ও চোখে ঝাপসা দেখা	৩. দুর্গন্ধযুক্ত স্রাব
৪. খিঁচুনি	৪. খিঁচুনি
৫. অনেকক্ষণ ধরে প্রসব বেদনা (১২ ঘণ্টার অধিক সময় ধরে থাকলে)	

গর্ভকালীন সময়ে কমপক্ষে ৪ বার ও প্রসব পরবর্তী ৪ বার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে। এছাড়াও কোনো সমস্যা/ বিপদ চিহ্ন দেখা দিলে দ্রুত হাসপাতাল/স্বাস্থ্যকর্মীর সাথে যোগাযোগ করতে হবে

অধিবেশন-৫ : গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী নারীর পুষ্টি ও যত্ন

গর্ভকালীন স্বাস্থ্য পরীক্ষা

প্রসব পরবর্তী স্বাস্থ্য পরীক্ষা

অধিবেশন-৬ : নারী ও শিশুর পুষ্টিতে মাছ

নারী ও শিশুর পুষ্টিতে মাছ, শুঁটকি মাছ ও মাছের পাউডার :

গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী নারীদের খাবারে মাছ, শুঁটকি মাছ ও মাছের পাউডার প্রয়োজনীয় পুষ্টি নিশ্চিত করতে পারে।

মাছ একটি উচ্চ পুষ্টিগুণসম্পন্ন নিরাপদ প্রাণিজ খাবার যা গর্ভস্থ শিশুর বৃদ্ধি ও বুদ্ধির বিকাশে খুব গুরুত্বপূর্ণ। শিশু, গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী নারীসহ পরিবারের সকলের পুষ্টি চাহিদা পূরণে নিয়মিত মাছ খাওয়া উচিত।

- মাছ আমিষ এবং উপকারী চর্বির উল্লেখযোগ্য উৎস
- মানবদেহে প্রয়োজনীয় অন্যান্য পুষ্টি উপাদান, যেমন- আয়রন, ভিটামিন এ, আয়োডিন, ভিটামিন ডি, জিংক, ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাসসহ প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান মাছ থেকে আসে
- মাছে মানবদেহের জন্য উপকারী ওমেগা-৩ ফ্যাটি এসিড আছে যা দেহের কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে ও হৃদরোগের (হার্ট অ্যাটাকের) ঝুঁকি কমায়
- এছাড়াও ছোটমাছ অন্ধত্ব, রাতকানা, রক্তস্বল্পতা, গলগন্ড ইত্যাদি রোগ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে
- মাছের তেল কিডনিতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি কমায়
- ছোটমাছ পাটায় বেটে শিশুকে খাওয়ানো ভালো।

- **শুঁটকি মাছে পুষ্টি উপাদানের ঘনত্ব তাজা/কাঁচা মাছের তুলনায় তিন-চার গুণ বেশি থাকে**
- **তাজা/কাঁচা মাছ রান্না করে শিশুকে খাওয়ানোর সময় বা নিজে খাওয়ার সময় কাঁটা বেছে ফেলে দিতে হয় যাতে ক্যালসিয়াম ও অন্যান্য পুষ্টি উপাদান থাকে**
- **শুঁটকি মাছ ও শুঁটকি থেকে বানানো পাউডারে আমিষ, ক্যালসিয়াম, জিংকসহ অন্যান্য পুষ্টি উপাদান খুব ভালো পরিমাণে পাওয়া যায়**
- **তাই শিশুসহ বাড়ির সবার খাবার তৈরিতে শুঁটকি মাছ বা কয়েক চামচ/পরিমাণমত মাছের পাউডার মিশিয়ে দিলে আরো বেশি পুষ্টি পাওয়া যাবে।**

মাছ শিশুর শারীরিক বৃদ্ধি, বুদ্ধির বিকাশে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে

অধিবেশন–৬: নারী ও শিশুর পুষ্টিতে মাছ

অধিবেশন-৭ : হাত ধোয়া ও নিরাপদ খাদ্য

হাত ধোয়া: হাত ধোয়া হলো হাতকে সাবান এবং পানি দিয়ে ভাইরাস/ব্যাকটেরিয়া/জীবাণু, ময়লা, বা অন্যান্য ক্ষতিকারক এবং অবাঞ্ছিত পদার্থ যা হাতের সাথে আটকে থাকে তা থেকে মুক্ত করা ।

হাত ধোয়ার গুরুত্ব: যেসব গুরুত্বপূর্ণ কারণে সঠিকভাবে হাত ধোয়া খুব জরুরী-

- খাদ্যসামগ্রী ও পানি সংক্রমিত হওয়া এড়াতে
- মুখে জীবাণু প্রবেশ করা এড়াতে
- ডায়রিয়ার সংক্রমণ এড়াতে
- কৃমির সংক্রমণ এড়াতে
- চর্মরোগের সংক্রমণ এড়াতে
- করোনা ভাইরাসের আক্রমণ ঠেকাতে
- অপুষ্টি না হওয়ার জন্য এবং
- সর্বোপরি সুস্থ থাকার জন্য।

হাত ধোয়ার সময়: প্রাত্যহিক জীবনে আমরা অনেকবার হাত ধুই। কিন্তু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সুপারিশ অনুযায়ী নিম্নোক্ত পাঁচটি বিশেষ সময়ে অবশ্যই সাবান দিয়ে ভালোভাবে হাত ধুতে হবে-

১) খাবার তৈরি/রান্না করার আগে

২) কোনো খাবার ধরা বা শিশুকে খাওয়ানোর আগে মা/যত্নকারী ও শিশুর হাত ধুয়ে নিতে হবে

৩) পায়খানা/টয়লেট ব্যবহার করার পরে

৪) শিশুর পায়খানা পরিষ্কার করার পরে

৫) গৃহপালিত পশু-পাখি ধরা এবং তাদের পায়খানা বা বাড়ির অন্য কোনো ময়লা পরিষ্কার করার পরে।

সঠিকভাবে হাত ধোয়ার নিয়ম: হাতের কব্জি পর্যন্ত (ময়লা থাকলে প্রয়োজনে কব্জির উপরেও) পানিতে ভিজিয়ে নেয়া, ভালভাবে সাবান লাগানো, প্রচুর ফেনা করে দুই হাতের আংগুলের ভাঁজ, নখের নীচ ও হাতের তালুসহ ভেজানো অংশ কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে ঘষে নেয়া এবং প্রবাহমান পরিষ্কার পানির ধারায় দুই হাতের ফেনা ভালোভাবে ধুয়ে ফেলা। ভেজা হাত পরিষ্কার ও শুকনা গামছা/তোয়ালে/কাপড়/টিস্যু দিয়ে মুছে নিতে হবে।

৫ টি বিশেষ সময়ে অবশ্যই সাবান দিয়ে ভালো করে দু-হাত ধুয়ে নিতে হবে

অধিবেশন-৭ : হাত ধোয়া ও নিরাপদ খাদ্য

হাতের কব্জি পর্যন্ত পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিন

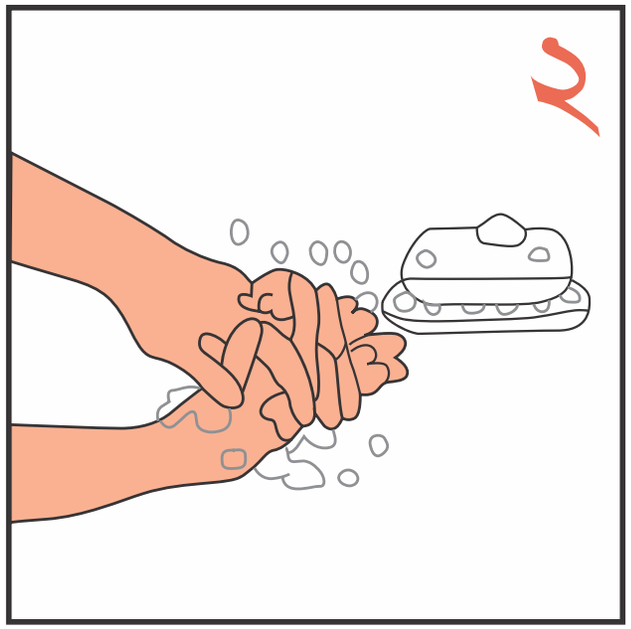

এবার হাতের কব্জি পর্যন্ত ভালোভাবে সাবান লাগান

প্রচুর ফেনা করে দুই হাতের আঙ্গুলের
ভাঁজ, নখের নিচসহ কব্জি পর্যন্ত
কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড ধরে ঘষে নিন

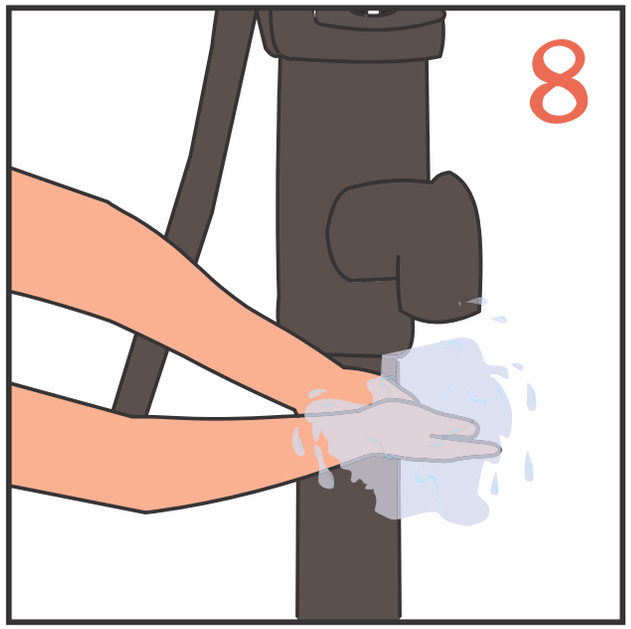

প্রবাহমান পরিষ্কার পানির ধারায়
দুই হাতের ফেনা ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন

নিরাপদ পানি দিয়ে পাত্র ধোয়া

অধিবেশন-৭ : হাত ধোয়া ও নিরাপদ খাদ্য

নিরাপদ খাদ্য :

নিরাপদ খাদ্য হলো সেই খাদ্য যা সঠিক নিয়মে পরিষ্কার ও নিরাপদভাবে সংগ্রহ, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রক্রিয়াজাত ও সংরক্ষণ করা হয় এবং খাদ্যে রোগজীবাণুর উপস্থিতির ঝুঁকি কম থাকে। উৎপাদন থেকে শুরু করে আহার করা পর্যন্ত প্রত্যেক ধাপে খাদ্য নিরাপদ ও পরিষ্কার রাখা উচিত । নিরাপদ খাদ্য গ্রহণ করলে শরীরের অর্থ্যাৎ স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় না এবং আমরা সুস্থ-সবল থাকি। রোগ-জীবানু দ্বারা দূষিত খাদ্য, রাসায়নিক দ্রব্য মিশ্রিত খাদ্য, খাবারের অংশ নয় এরূপ বস্তু দ্বারা মিশ্রিত খাদ্য হলো অনিরাপদ খাদ্য, যা খেলে নানা ধরনের অসুখ হয়।

অনিরাপদ খাদ্যের ক্ষতিকর প্রভাব :

- অনিরাপদ খাদ্য গ্রহণ করলে হজম বাধাগ্রস্থ হয়
- অনিরাপদ খাদ্য ডায়রিয়াসহ পেটের পীড়া, টাইফয়েড, হেপাটাইটিস ইত্যাদি রোগের প্রধান কারণ
- অনিরাপদ খাদ্য গ্রহণে শিশু, গর্ভবতী নারী, দুগ্ধদানকারী মা, বয়স্ক ও অসুস্থ ব্যক্তি সহজেই রোগাক্রান্ত হতে পারে যা পরবর্তীতে অপুষ্টিতে রূপ নেয়। বিশেষ করে, শিশুরা তীব্র অপুষ্টিতে ভুগতে পারে
- বাড়ির পরিবেশ অপরিচ্ছন্ন থাকলে এবং খাবার খোলা রাখলে খাবারে জীবাণু বাসা বাঁধে। এসব খাবার খেয়ে মানুষ অসুস্থ হয়ে যায়।

খাদ্য নিরাপদ রাখার উপায়/চাবিকাঠি: খাদ্য নিরাপদ রাখার ৫টি চাবিকাঠি-

১) সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা

২) কাঁচা ও রান্না করা খাবার আলাদা রাখা

৩) সঠিক তাপমাত্রায় রান্না করা (শাকসবজির ক্ষেত্রে মাছ বা মাংসের তুলনায় কম তাপে রান্না করা)

৪) সঠিক তাপমাত্রায় খাদ্য সংরক্ষণ করা

৫) নিরাপদ পানি ও নিরাপদ খাদ্য উপকরণ ব্যবহার করা।

সুস্থ থাকতে হলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে এবং খাদ্য নিরাপদ রাখার চাবি কাঠিগুলো মেনে চলতে হবে

অধিবেশন-৭ : হাত ধোয়া ও নিরাপদ খাদ্য

তরি-তরকারি ও শাকসবজি সঠিকভাবে কাটা

নিরাপদ পানি দিয়ে ধোয়া

রান্নার সময় ঢাকনা ব্যবহার করা

রান্না করা খাবার ঢেকে রাখা

তথ্যসূত্রঃ বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ, খাদ্য মন্ত্রণালয়।

অধিবেশন-৭ : হাত ধোয়া ও নিরাপদ খাদ্য

স্বাস্থ্যসম্মতভাবে খাবার তৈরি করার উপায়:

খাদ্যের পুষ্টিমান বজায় রাখতে সঠিক প্রস্তুত প্রণালী ও সংরক্ষণের দিকে মনোযোগী হওয়া দরকার। স্বাস্থ্যসম্মতভাবে খাদ্য তৈরি করতে নিচের বিষয়গুলো অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে-

- রান্নার পূর্বে এবং খাওয়ার আগে ভালোভাবে হাত সাবান ও পানি দিয়ে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিন এবং খাদ্য প্রস্তুতিতে পরিষ্কার ও নিরাপদ পানি ব্যবহার করুন
- রান্নার পুর্বে মাছ, মাংস, শাকসবজি ও ফলমূল পরিষ্কার পানি দিয়ে ধোয়া উচিত, তা না হলে জীবাণু সংক্রামণ হতে পারে
- রান্নার জন্য তরকারী বড় বড় টুকরা করে কাটা উচিত, এতে খাবারের পুষ্টিগুণ বজায় থাকে
- ছোট মাছ (যেমন মলা, ঢেলা, দারকিনা ইত্যাদি) হলে কাটাকাটি না করে পরিষ্কার পানিতে ১-২ বার ধুয়ে রান্না করা যেতে পারে। তবে মাঝারি ও বড় আকারের ছোট মাছের জন্য মাছ কাটা-বাছার সাধারণ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে। প্রথমে আঁইশ, পাখনাসমুহ ও পাকস্থলি ফেলে দিতে হবে। তবে মাছের আকার ছোট বা বড় যাই হোক না কেন, মাছের মাথা কেটে ফেলে দেয়া যাবে না। কারন মলা, ঢেলা, দারকিনাসহ অন্যান্য ছোট মাছের বেশির ভাগ ভিটামিন ও মিনারেল মাথায় থাকে
- খাবার ভালভাবে রান্না করা অর্থাৎ কোন অংশ কাঁচা না রাখা-যেন সকল জীবাণু মারা যায়। মাছ, মাংস, ডিম, মুরগি ভালো তাপে রান্না করা উচিত। ডিম কাঁচা অবস্থায় খাওয়া উচিত নয়
- ছোট মাছ কখনোই দীর্ঘ সময় ধরে রান্না করা উচিত নয়। বেশির ভাগ রান্নাই সর্বোচ্চ ১০-১৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করা সম্ভব। অন্যান্য উপকরণ সিদ্ধ/রান্না হতে বেশি সময় লাগলে ছোট মাছগুলোকে রান্না শেষ হওয়ার ১০-১৫ মিনিট আগে যোগ করা উচিত
- বাসি খাবার খাওয়ার আগে পানি ফুটানোর তাপমাত্রা পর্যন্ত গরম করে নেয়া
- ধুলাবালি এড়ানোর জন্য খাদ্যের পাত্র ও রান্নার হাড়ি মেঝেতে না রাখা। রান্নার জন্য ব্যবহৃত তৈজসপত্র যেমন বটি, ছুরি, দা ইত্যাদি ব্যবহার করার পর ভালভাবে ধোয়া উচিত। যদি সম্ভব হয় পুনরায় ব্যবহারের জন্য তা গরম পানি ও সাবান দিয়ে পরিষ্কার করা
- খাবারে আয়োডিন যুক্ত লবণ ব্যবহার করতে হবে।

স্বাস্থ্যসম্মতভাবে খাদ্য প্রস্তুত করুন এবং খাদ্যের পুষ্টিমান রক্ষা করুন

অধিবেশন-৭ : হাত ধোয়া ও নিরাপদ খাদ্য

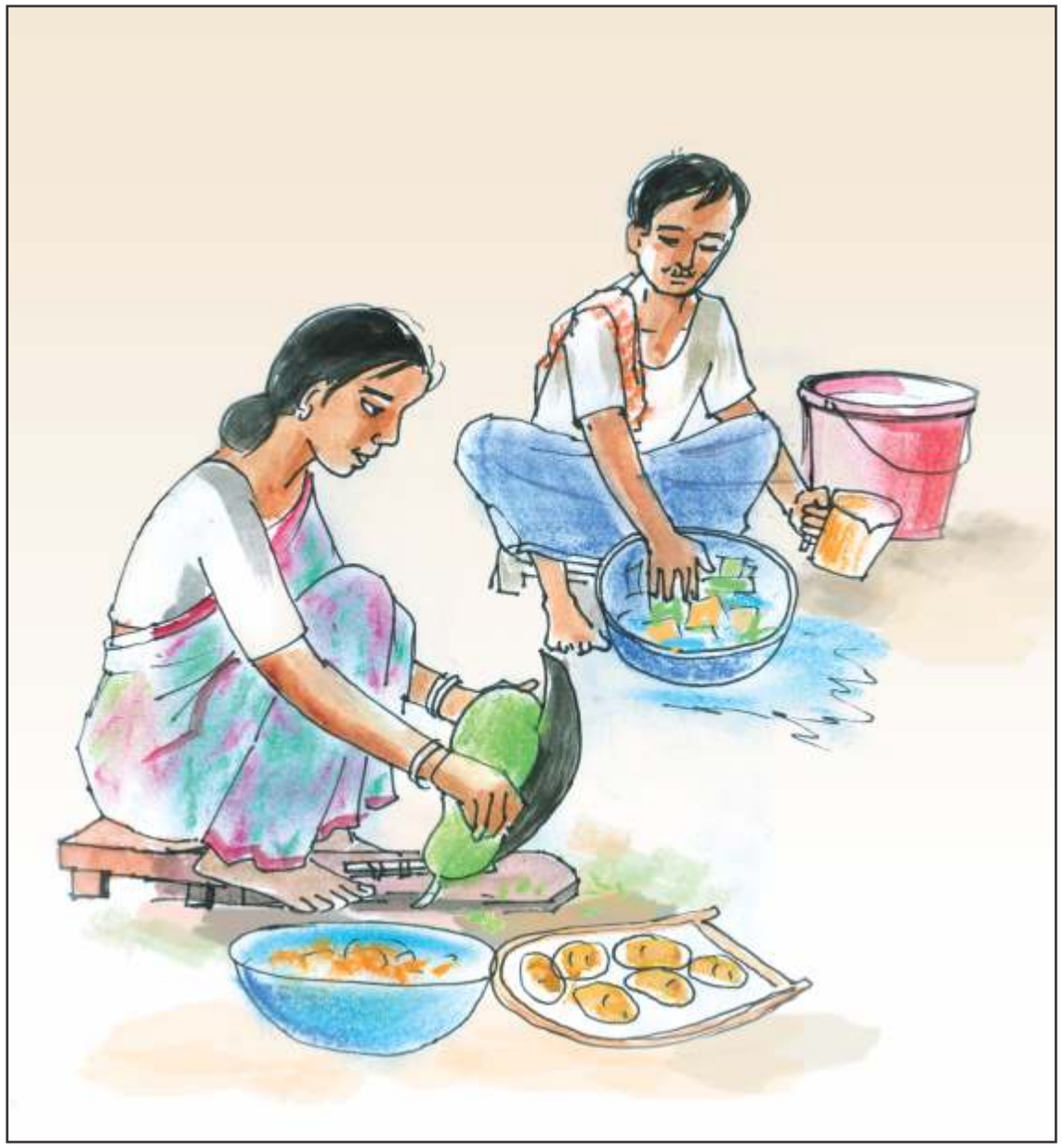

সবজি বড় করে টুকরো করুন এবং খোসা ছড়ানোর আগে পরিষ্কার পানি দিয়ে ধুয়ে নিন
এবং ছোট মাছের মাথা কেটে ফেলা যাবে না, পরিষ্কার পানি দিয়ে রান্না করতে হবে

অধিবেশন-৮ : নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা

নিরাপদ পানি পান :

যে পানিতে কোনো ময়লা বা রোগজীবাণু থাকে না, ক্ষতিকর কোনো রাসায়নিক উপাদান মিশ্রিত থাকে না, এরকম পরিষ্কার পানি যা পান করলে কোনো ক্ষতি হয় না সেটাই নিরাপদ পানি। সবাইকে নিরাপদ পানি পান করতে হবে।

নিরাপদ পানি পাওয়ার উপায়-

- আর্সেনিকমুক্ত টিউবওয়েলের পানি
- পানির ফিল্টার ব্যবহার করা
- পানি ফুটিয়ে নেয়া
- পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ব্যবহার
- বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা।

ডায়রিয়া, কলেরা, টাইফয়েড ইত্যাদি ব্যাকটেরিয়া সৃষ্ট রোগ থেকে বাঁচতে অবশ্যই নিরাপদ পানি ব্যবহার করতে হবে।

মিনার তিন ইচ্ছার গল্প :

একদিন মিনা স্বপ্নে দেখলো, সে তার ছোট ভাই রাজু ও টিয়া পাখি মিঠুকে নিয়ে যাদুর পাটিতে চড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে আর তাদের গ্রামটি উপর থেকে দেখছে। তারা দেখতে পাচ্ছিল গ্রামের লোকেরা নদীর ধারে খোলা জায়গায় পায়খানা করছে আর সেই পায়খানা নদীর পানিতে মিশে পানি দূষিত করছে। সেই দূষিত পানিতে আবার গ্রামের সকলে গোসল করছে, থালা-বাসন ধুচ্ছে এবং খাওয়ার জন্য পানি নিয়ে যাচ্ছে। বাড়ির লোকেরা সেই দূষিত পানিই পান করছে। এক বাড়ির বাচ্চার পাতলা পায়খানা হয়েছে দূষিত পানি পান করার জন্য। এসব দেখে মিনার খুব খারাপ লাগছিল। সে ভাবছিল, গ্রামের সবাই যদি স্যানিটারি ল্যাট্রিন ব্যবহার করত তাহলে কারো রোগ হতো না, সবাই সুস্থ থাকত। এসময় সে একটি যাদুর কুপি পেল। কুপিতে ঘষা দিতেই এক দৈত্য এসে মিনাকে বললো, সে মিনার তিনটি ইচ্ছা পূরণ করবে। তখন মিনা দৈত্যকে বললো, গ্রামের সবার বাড়িতে স্যানিটারী ল্যাট্রিন বা স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা তৈরি করে দিতে, টিউবওয়েল স্থাপন করতে এবং সবাইকে পায়খানা ব্যবহারের পর সাবান দিয়ে হাত ধুতে বলতে। দৈত্য মিনার তিনটি ইচ্ছাই পূরণ করলো।

স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার: যেখানে সেখানে মল-মূত্র ত্যাগ করলে তা থেকে রোগ-জীবাণু বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। জীবাণু আক্রান্ত এ পায়খানা মাটিতে মিশে যায়। বাতাস ও বৃষ্টি বা জোয়ারের পানিতে জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে। মাছির মাধ্যমে রোগ-জীবাণু খাবারে চলে আসে। সেই খাবার খেয়ে ও দূষিত পানি ব্যবহার করে এবং আরো বিভিন্নভাবে রোগ-জীবাণু মানুষের শরীরে ঢুকে নানা ধরনের অসুস্থতার সৃষ্টি করে। এভাবে যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগের কারণে এবং মলমূত্রের নিরাপদ ব্যবস্থাপনা না হলে অসুস্থতার ঝুঁকি থাকে, এমনকি শিশুর মৃত্যুও হতে পারে। পয়ঃনিষ্কাশনের সঙ্গে শিশুর অপুষ্টির সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। তাই সুস্থ থাকার জন্য-

- স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করতে হবে
- জুতা বা স্যান্ডেল পরে পায়খানায় যেতে হবে
- পায়খানা থেকে আসার পর অবশ্যই সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিতে হবে
- খাবার ঢেকে রাখতে হবে।

নিরাপদ পানি পান করুন ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করুন

অধিবেশন-৮ : নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা

আর্সেনিকমুক্ত টিউবয়েলের পানি ব্যবহার করা

পানির ফিল্টার ব্যবহার করা

পানি ফুটিয়ে নেয়া

পানিতে বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ব্যবহার করা

স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন

অধিবেশন-৯ : কিশোরীর পুষ্টি

কৈশোরকাল : শৈশবকাল থেকে যৌবনে পদার্পনের মধ্যবর্তী সময় (১০-১৯ বছর)-কে কৈশোরকাল বলা হয় এবং এই বয়সের ছেলে-মেয়েদেরকে কিশোর-কিশোরী বলা হয়। কৈশোরকাল জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময় এবং এ সময় তাদের বিভিন্ন ধরণের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটে, তাই এ সময় তাদের পুষ্টি চাহিদাও বৃদ্ধি পায়।

কৈশোরকালে উচ্চতা, ওজন ও দৈহিক গঠনের পরিবর্তন :

উচ্চতার ক্ষেত্রে পরিবর্তন

- মোট উচ্চতার ১৫-২০% এই সময়ে হয়
- মেয়েদের চাইতে ছেলেদের দৈহিক বৃদ্ধি দেরীতে শুরু হয়

ওজনের ক্ষেত্রে পরিবর্তন

- মোট ওজনের ২৫-৫০% এই সময়ে হয়

দৈহিক গঠন ও কাঠামোর ক্ষেত্রে পরিবর্তন

- প্রায় ৪৫% শরীরের কাঠামোর (মাংসপেশী) অংশ বিশেষ এই সময়ে যোগ হয়
- জন্ম থেকে কৈশোরকালের মধ্যে শরীরের হাড়ের গঠনের ৯০ ভাগ সম্পন্ন হয়
- মেয়েদের তুলনায় ছেলেরা এই সময় তুলনামূলক ভাবে বেশী মাংসপেশী লাভ করে।

কৈশোরকালে পুষ্টির গুরুত্ব :

কৈশোরে মানুষের জীবনযাত্রা ও খাবারের রুচির পরিবর্তন হয়। অপর্যাপ্ত পুষ্টির কারণে কৈশোরকালীন স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে এবং তা দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে। যেমন-

- আয়রনের অভাবে কৈশোরকালীন শারীরিক বৃদ্ধি বিলম্বিত হতে পারে। বিশেষ করে কিশোরীদের শারীরিক বৃদ্ধি ও মাসিক ঋতুস্রাবের কারণে শরীরে আয়রনের চাহিদা বেড়ে যায়
- আয়রন ঘাটতির কারণে শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, স্বাভাবিক জ্ঞান বৃদ্ধি ও বিকাশ কমে যায় এবং পড়ালেখার প্রতি মনোযোগ অনেকাংশে কমে যায়। ফলে স্কুলে যাবার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে
- কিশোরী অবস্থায় গর্ভধারণ (বিশেষ করে মা যদি অপুষ্টিতে ভোগেন ও বেঁটে হন) মা ও শিশু উভয়ের স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে পড়ে যায়।

পরিবারের কিশোর-কিশোরীর প্রতি যত্নশীল হোন ও প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাবার খাওয়ান

অধিবেশন-৯ : কিশোরীর পুষ্টি

ভাত

মাছ

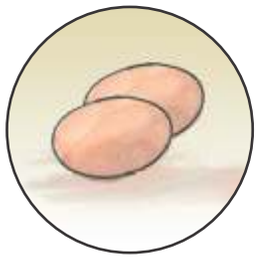
ডিম

ডাল

শাক

মাংস

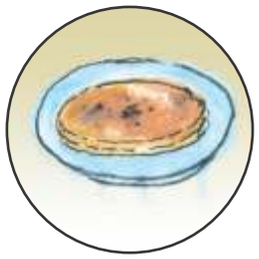
রুটি

দুধ

কিশোরীদের সুস্বাস্থ্য রক্ষায় পারিবারিকভাবে পুষ্টিকর খাবার নিশ্চিত করুন

অধিবেশন-৯ : কিশোরীর পুষ্টি

কৈশোরকালীন অপুষ্টি প্রতিরোধে করণীয় :

- সুষম খাবার খাওয়া (এমন একটি খাবার যা শক্তিদায়ক, শরীর বৃদ্ধিকারক ও রোগ প্রতিরোধক)
- প্রতিদিন ১০- ১২ গ্লাস পানি খাওয়া। গরম কালে বেশি পানির প্রয়োজন হতে পারে
- ডাক্তার বা স্বাস্থ্যকর্মীর পরামর্শ অনুযায়ী আয়রন এবং ফলিক এসিড ট্যাবলেট খাওয়া
- কিশোরীকে টিটেনাস টিকার ৫টি ডোজ সম্পূর্ণ দেওয়া
- প্রত্যেক কিশোর-কিশোরীকে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী ছয় মাস অন্তর কৃমিনাশক ট্যাবলেট খাওয়া
- খাবার খাওয়ার আগে ও পরে সাবান ও নিরাপদ পানি দিয়ে হাত ধোয়া
- স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা এবং জুতা বা স্যান্ডেল পরে পায়খানায় যাওয়া
- মাসিক ঋতুস্রাবের সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা। তাদের মনে রাখতে হবে যে এ সময় সব ধরণের খাবার খাওয়া যায় এবং সব ধরণের স্বাভাবিক কাজ কর্ম করা যায়
- প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে বিয়ে ও গর্ভধারণ করা।

কিশোর-কিশোরীদের দৈনিক নমুনা খাদ্য তালিকা :

প্রতিদিন কিশোর-কিশোরীদের নানান জাতীয় পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে। একজন কিশোর/কিশোরী কী কী খাবার খেলে তার দৈনিক পুষ্টি চাহিদা পূরণ হবে তার একটি নমুনা তালিকা নিচে দেয়া হল:

কিশোর-কিশোরীর দৈনিক নমুনা খাদ্য তালিকা (২৫০ মি: লি: বাটির হিসাব)

সকালের খাবার	সকালের নাস্তা	দুপুরের খাবার	বিকালের নাস্তা	রাতের খাবার
- মাঝারি সাইজের ২টি রুটি অথবা ১ বাটি ভাত - ১ বাটি সবজি অথবা - ১টি ডিম	- যে কোন দেশী মৌসুমি ফল - বাড়ীতে তৈরি নাস্তা জাতীয় খাবার	- ২/৩ বাটি ভাত - ১ বাটি শাকসবজি - ১ বাটি ঘন ডাল - ১ টুকরা মাছ/ মাংস/কলিজা	- দুধ দিয়ে তৈরি ঘন যে কোন খাবার (পায়েশ ও দই ইত্যাদি) - যে কোন দেশী মৌসুমি ফল/বাড়ীতে তৈরি নাস্তা জাতীয় যে কোন খাবার	- ২/৩ বাটি ভাত - ১ বাটি শাকসবজি - ১ বাটি ঘন ডাল - ১ টুকরা মাছ/মাংস (যদি সম্ভব হয়)

এছাড়াও কিশোরীদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় আয়রন সমৃদ্ধ খাবার থাকা বাঞ্চনীয়

অধিবেশন-৯ : কিশোরীর পুষ্টি

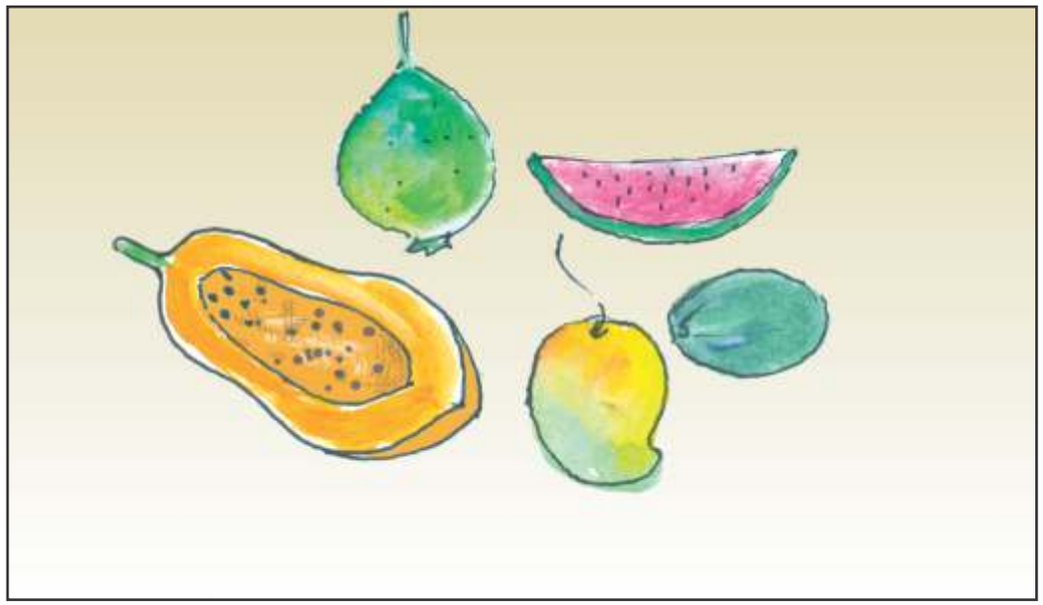

কিশোরীদের সুস্বাস্থ্য রক্ষায় পারিবারিকভাবে পুষ্টিকর খাবার নিশ্চিত করুন

অধিবেশন-১০: বাল্যবিবাহ, এর কারণ, ফলাফল ও প্রতিরোধের উপায়

বাল্যবিবাহ: বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ একটি মারাত্মক সমস্যা। আইনত মেয়েদের ১৮ বছর ও ছেলেদের ২১ বছর বয়সের আগে বিয়ে হলে তাকে বাল্যবিবাহ বলে।

বাল্যবিবাহের কারণসমূহ	বাল্যবিবাহের পরিণতি বা ফলাফল
▪ বাবা-মার অজ্ঞতা ▪ শিশুদের/সন্তানদের প্রতি অবহেলা ▪ লেখাপড়ার সুযোগ কম থাকা ▪ বিবাহ আইন সম্পর্কে ধারণা কম থাকা ▪ কন্যাকে দায় মনে করা ▪ অল্প বয়সী মেয়েকে বিয়ে করার প্রবণতা ▪ সামাজিক যৌন নিরাপত্তার অভাব।	▪ অল্প বয়সী নারী ও পুরুষের পক্ষে সংসারের দায়-দায়িত্ব নেয়া কষ্টকর হয় ▪ স্ত্রী এবং সংসারের প্রতি অবহেলা দেখা দেয় ▪ অল্প বয়সে সন্তান ধারণ করে যার ফলে অপুষ্ট শিশুর জন্ম হয়, মা ও শিশু মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়ে ▪ শিশু মায়ের দুধ থেকে বঞ্চিত হয় ▪ সন্তান লালন-পালনে কষ্ট হয়, শারীরিক ও মানসিক চাপ পড়ে ▪ প্রসবজনিত জটিলতার ফলে মায়ের প্রজননতন্ত্রের সংক্রমণের দীর্ঘস্থায়ী সমস্যার সৃষ্টি করে ▪ দাম্পত্য জীবনে কলহের সৃষ্টি হয় যার ফলে বিবাহ বিচ্ছেদও হতে পারে।

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের উপায়:

- বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা
- ছেলে ও মেয়ে উভয়ের শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা
- মেয়েদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা
- সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা
- ইউনিয়ন ভিত্তিক বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ কমিটি গঠন
- জন্ম নিবন্ধন সনদ ব্যতিত কোনো অবস্থায়ই বিবাহ রেজিস্ট্রি/নিবন্ধন না করা
- বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ আইন সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা
- বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক বিবাহ বন্ধসহ মামলা করা।

আঠারোর আগে বিয়ে নয়, কুড়ির আগে সন্তান নয়
বাল্যবিবাহ রোধ করি, সুস্থ সবল জাতি গড়ি

অধিবেশন-১০: বাল্যবিবাহ, এর কারণ, ফলাফল ও প্রতিরোধের উপায়

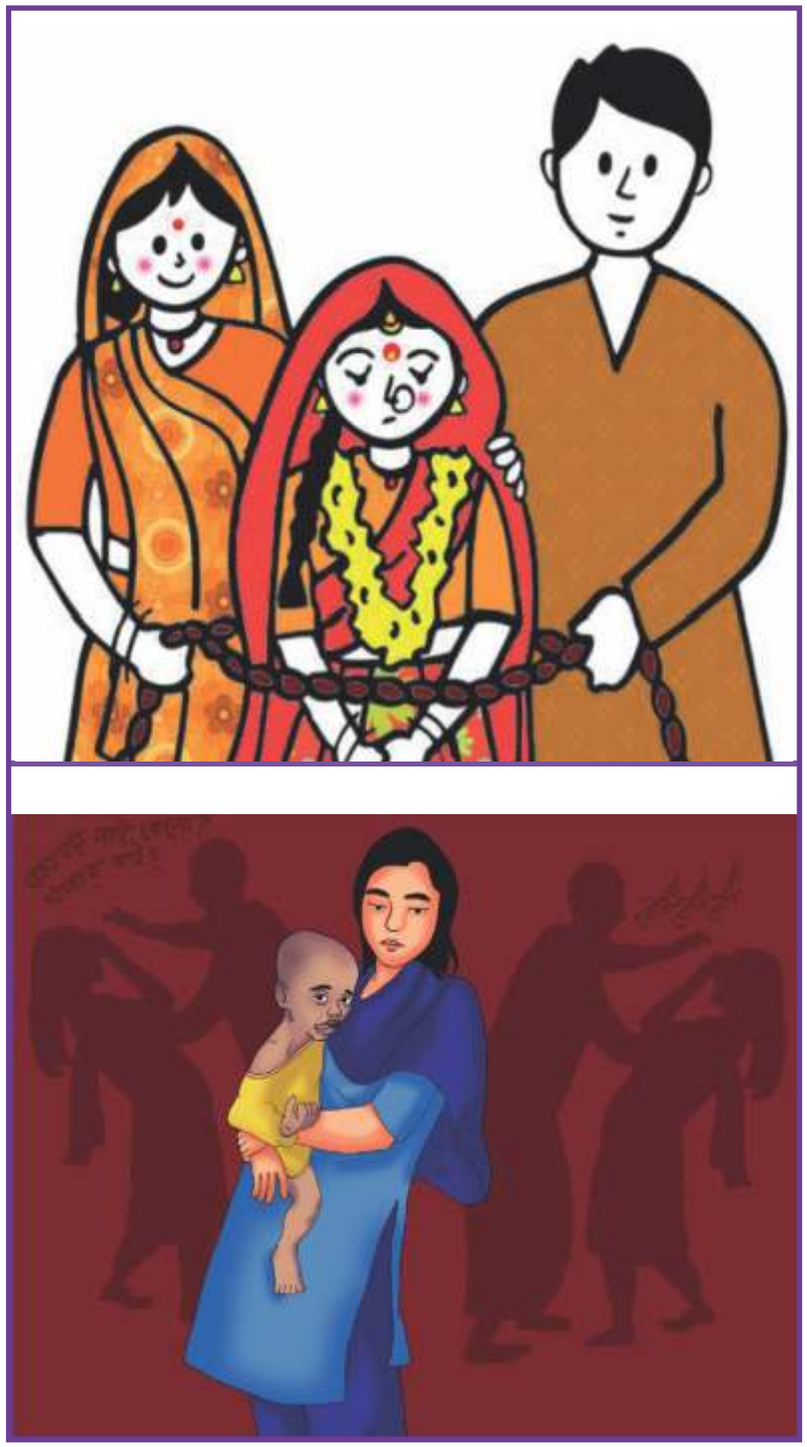

বাল্যবিবাহ ও ফলাফল

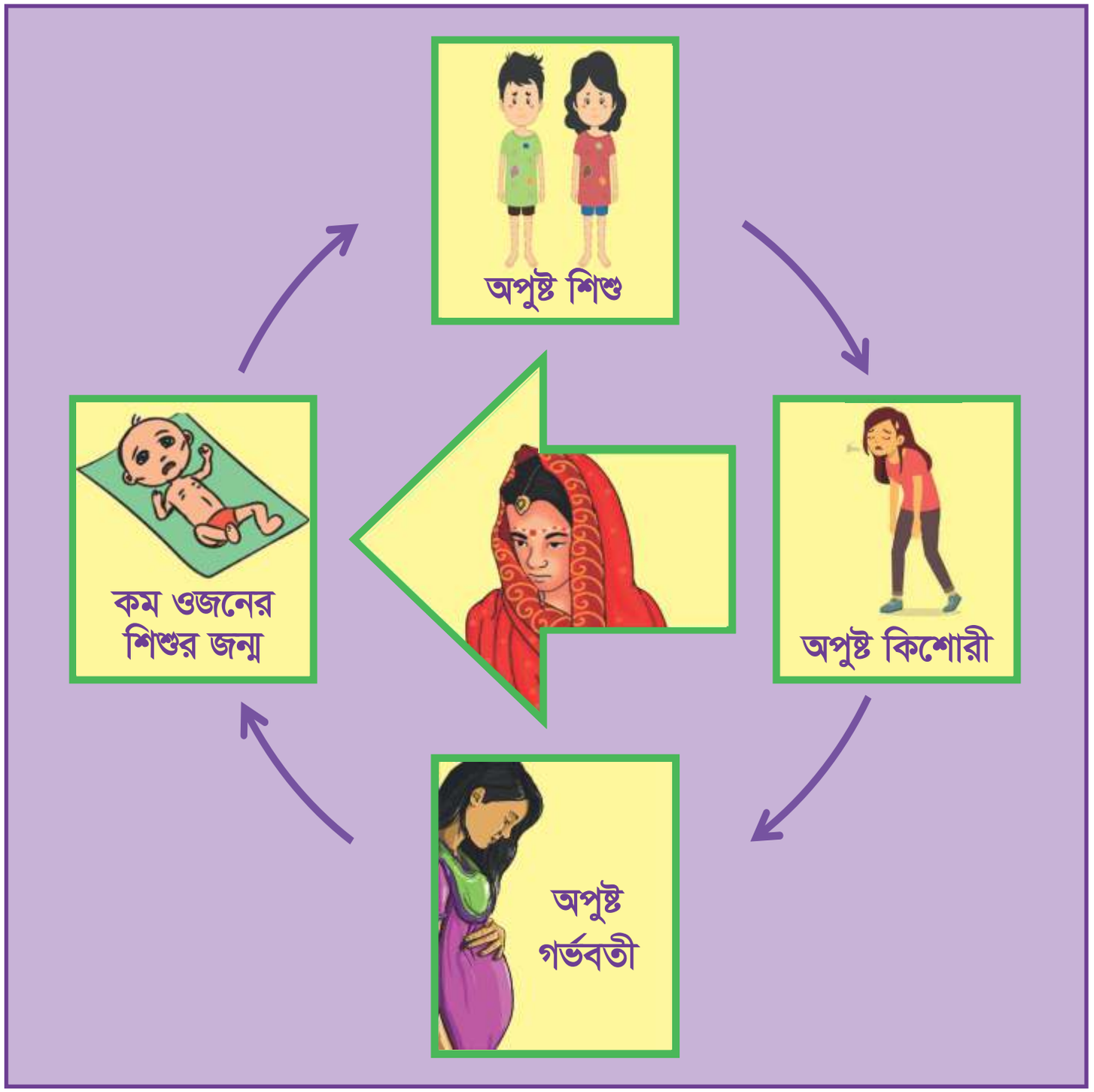

বাল্যবিবাহের ফলে চলমান অপুষ্টির চক্র

অধিবেশন-১১: পুষ্টি উন্নয়নে পরিবার পরিকল্পনা সেবা গ্রহণ

পরিবার পরিকল্পনা: পরিবার পরিকল্পনা হলো সঠিক সময়ে সন্তান নেয়ার পরিকল্পনা। একটি সক্ষম দম্পতি কখন কয়টি সন্তান গ্রহণ করবেন, দুটি সন্তানের মাঝে কতদিনের বিরতি দেবেন তা ঠিক করা এবং সে অনুযায়ী যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন করাই হলো পরিবার পরিকল্পনা।

পরিবার পরিকল্পনা কেন প্রয়োজন: একটি সুস্থ-সবল ও সুখী পরিবার সবার প্রত্যাশা, যার জন্য চাই সঠিক পরিকল্পনা। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ করলে-

- অনিচ্ছাকৃত গর্ভপাত ও মৃত সন্তান প্রসব কমানো যায় এবং সর্বোপরি মাতৃমৃত্যুর হার কমানো যায়
- মায়ের রক্ত স্বল্পতার ঝুঁকি কমানো যায়, মায়ের স্বাস্থ্য ভালো থাকে
- অনাকাঙ্খিত গর্ভধারণ ও বারবার বা ঘনঘন গর্ভধারণ রোধ করা যায়
- মা তার শিশুকে সময় নিয়ে দীর্ঘদিন দুধ খাওয়াতে ও যথাযথ যত্ন নিতে পারে, ফলে শিশুর স্বাস্থ্য ভালো থাকে এবং মা ও শিশুর বন্ধন দৃঢ় হয়
- সন্তান সংখ্যা কম থাকলে স্বল্প আয়েও আর্থিকভাবে স্বচ্ছল থাকা যায় ও আয় অনুযায়ী ভালোভাবে সংসার চালানো যায়
- সন্তানের পুষ্টিকর খাবার, প্রয়োজনীয় পোশাক ও শিক্ষা দেয়া যায়, ফলে পরিবারে সুখ শান্তি আসে
- দেশের দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করা যায়, পৃথিবীর নির্দিষ্ট সম্পদের উপর চাপ কমে ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়
- যৌনরোগসহ এইচআইভি/এইডস থেকেও রক্ষা পাওয়া যায়।

পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিসমূহ: পরিকল্পিতভাবে পরিবার গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন সঠিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি বাছাই করা।

স্থায়ী পদ্ধতি	অস্থায়ী পদ্ধতি		
	দীর্ঘমেয়াদী	**স্বল্পমেয়াদী**	**সনাতন পদ্ধতি**
▪ পুরুষদের জন্য স্থায়ী পদ্ধতি এনএসডি (ভ্যাসেকটমি) ▪ নারীদের জন্য স্থায়ী পদ্ধতি লাইগেশন (টিউবেকটমি)	ইমপ্লান্ট, আইইউডি (নারীদের জন্য)।	খাবার বড়ি, কনডম, জন্মনিয়ন্ত্রন ইনজেকশন, জরুরী গর্ভনিরোধক বড়ি।	শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানো নির্ভর পদ্ধতি; এই পদ্ধতি প্রসবের পর ছয় মাস পর্যন্ত কার্যকরী। মাসিকের মধ্যবর্তী নিরাপদকালের ব্যবহার।

- যে সব দম্পতির দুটি সন্তান আছে এবং ভবিষ্যতে আর কোনো সন্তান নিতে চান না তাদের জন্য স্থায়ী পদ্ধতি;
- যে সব দম্পতি প্রথম সন্তান দেরিতে নিতে চান অথবা দুই সন্তানের মাঝে বিরতি নিতে চান তাদের জন্য একাধিক বছর গর্ভধারণ থেকে বিরত থাকার জন্য দীর্ঘমেয়াদি পদ্ধতি অধিক উপযোগী।

পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে পরামর্শ ও সেবা নিতে নিকটস্থ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মীর কাছে, স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা হাসপাতালে যান অথবা পরিবার পরিকল্পনা সেবার হটলাইন এই ১৬৭৬৭ নাম্বারে যোগাযোগ করুন

অধিবেশন-১১: পুষ্টি উন্নয়নে পরিবার পরিকল্পনা সেবা গ্রহণ

মিশ্র খাবার বড়ি

কনডম

ইনজেকশন

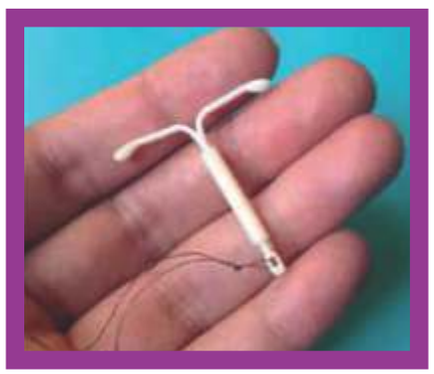

আইইউডি

ইমপ্ল্যান্ট

অধিবেশন-১২: পুষ্টি নিশ্চিতকরণে নারী-পুরুষের সমতায়ন

পারিবারিক পুষ্টি নিশ্চিত করতে নারী-পুরুষ সবার ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। সিদ্ধান্তগ্রহণ থেকে শুরু করে সব সুযোগ-সুবিধা সমানভাবে উপভোগ করবে নারী ও পুরুষ। তবেই পরিবারের সকলের সঠিক পুষ্টি ও স্বাস্থ্য নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

১. পারিবারিক খাবারের সুষম বণ্টন

- অনেক পরিবারের মধ্যে লিঙ্গের ভিত্তিতে খাবারের বৈষম্যের উপস্থিতি তীব্র অর্থাৎ কেউ কেউ অন্যদের তুলনায় বেশি খাবারের সুযোগ পায়, আবার কেউ সুবিধা বঞ্চিত হয়ে কম পায়
- এ বৈষম্যের ফলে মেয়ে বা কিশোরীরা পুরুষ সদস্যদের তুলনায় কম সুবিধা পায় এবং অপুষ্টিতে আক্রান্ত হয়, যার পরিণতি ভয়াবহ
- ছেলে সন্তানের মতো মেয়ে বা কিশোরীরও পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি দরকার। তাই, তার স্বাভাবিক শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি চাহিদা পূরণে পরিবারের সবাইকে সচেতন হতে হবে। পরিবারের ছেলে-মেয়ে বা কিশোর-কিশোরীকে সমানভাবে খাবার বণ্টনে বাবা-মা এবং অন্য সদস্যদের দায়িত্ব নিতে হবে
- পরিবারের নারী সদস্যরাও পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয়। গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী নারী প্রয়োজনীয় পুষ্টি না পেলে সন্তানের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশ ব্যাহত হয়।

**সুস্থ ও সবল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য কিশোরী,
গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারীকে তাদের প্রয়োজনীয় বৈচিত্র্যময় ও পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে**

Reprinted with permission from Suchana, Save the Children

অধিবেশন-১২ : পুষ্টি নিশ্চিতকরণে নারী-পুরুষের সমতায়ন

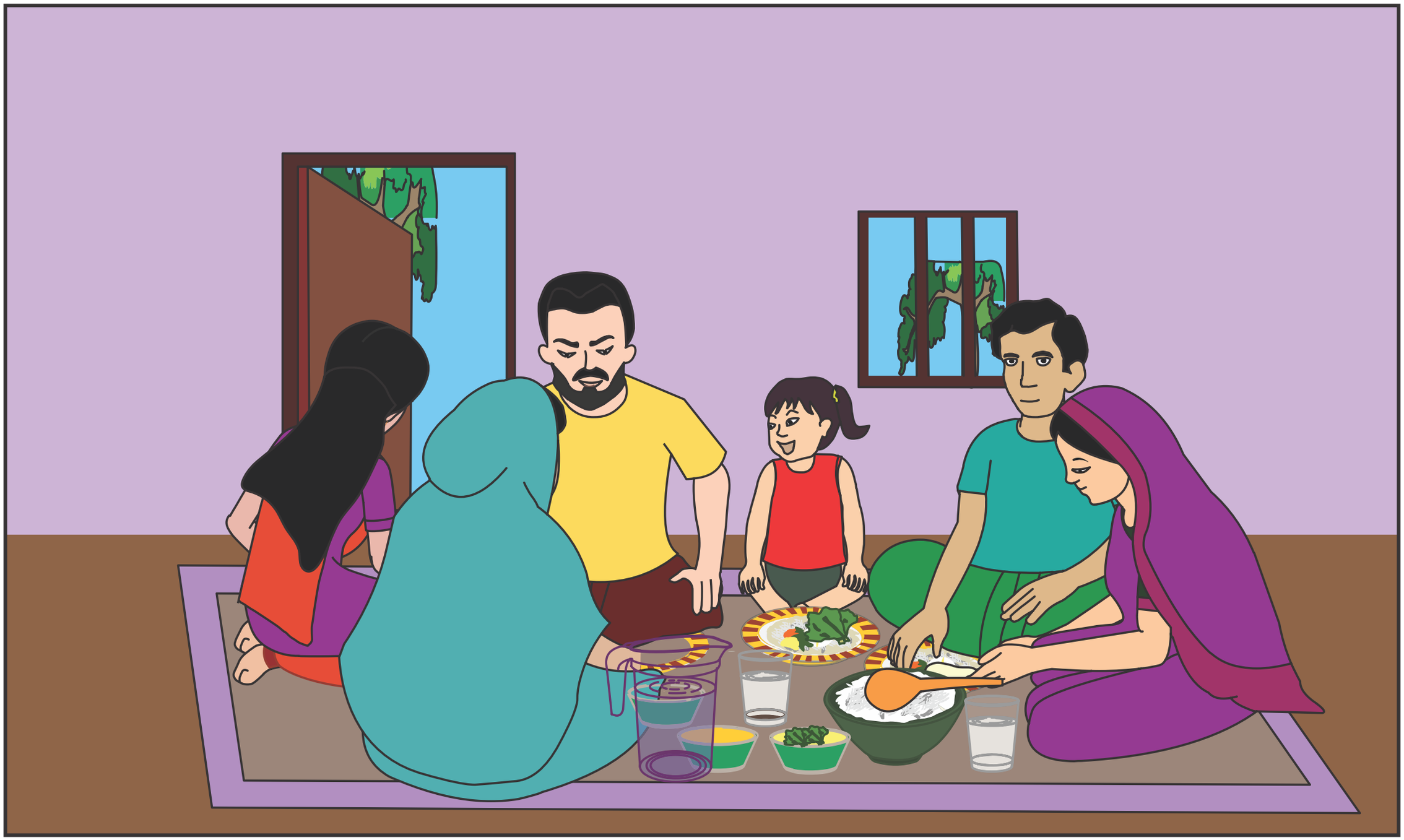

পারিবারিক খাবারের সুষম বণ্টন

Reprinted with permission from Suchana, Save the Children

২. গৃহস্থালী দৈনন্দিন কাজগুলো পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়া

গৃহস্থালী কাজ শুধু নারীর একার নয়, পরিবারের সব সদস্যের। গৃহস্থালী কাজগুলো ভাগাভাগি করে নিলে নারীর কাজের চাপ কমবে। এর ফলে–

- গর্ভবতী নারী দিনের বেলায় ঘুমাতে এবং বিশ্রাম নিতে পারবেন
- দুগ্ধদানকারী মা শিশুকে বার বার এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ খাওয়াতে পারবেন
- পরিবারের সবাই কাজ ভাগ করে নেয়ার মাধ্যমে একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে পারবে
- গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারী মায়ের যত্ন নিলে, বাড়বে শিশু সঠিক ভাবে।

উৎপাদনমূলক কাজে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পরিবারের পুরুষ সদস্য গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করতে পারেন। উৎপাদনমূলক কাজে নারীর অংশগ্রহণের বেশ কিছু সুবিধা আছে যেমন–

- গবাদি পশু–পাখি পালন, শাকসবজি চাষ, মাছ চাষ, শুঁটকি উৎপাদন, সেলাই ইত্যাদির মাধ্যমে নারীরা পরিবারের সদস্যদের পুষ্টির চাহিদা পূরণের পাশাপাশি আর্থিক সংকটের সময় সহযোগিতা করতে পারবেন
- নারীরা নিজেকে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুলতে পারবেন, একজন আত্মনির্ভরশীল নারী পরিবারের পাশাপাশি সমাজের জন্যও আদর্শ।

৩. নারীর জ্ঞান এবং দক্ষতা পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে

নারীরা যদি তাদের পরিবারের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় বাদ পড়েন, তাহলে সন্তানদের স্বাধীন, উদ্যমী এবং ক্ষমতাবান অনুভূতি নিয়ে বড় করতে পারেন না। আবার, সন্তানদের চাহিদা অনুযায়ী সঠিক পুষ্টিও নিশ্চিত করতে পারেন না।

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়– একজন পুরুষ যেহেতু বাজার করেন, সেক্ষেত্রে তিনি সিদ্ধান্ত নেন কী কেনা হবে এবং খাবার কী হবে, কিন্তু খাবার তৈরি করেন নারী। মা ভালো জানেন কোন খাবারটি বাচ্চার জন্য উপযোগী, বাচ্চারা কোন খাবার পছন্দ করে এবং বাচ্চার কী খাওয়া দরকার।

তাই, শিশুর পুষ্টি নিশ্চিতে মায়ের পুষ্টি জ্ঞান ও পরিবারের সকলের সহযোগিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

নারী ও পুরুষ একসাথে সিদ্ধান্ত নিলে, পারিবারিক সমস্যার সমাধান সহজে মেলে

Adapted from Suchana, Save the Children

অধিবেশন-১২ : পুষ্টি নিশ্চিতকরণে নারী-পুরুষের সমতায়ন

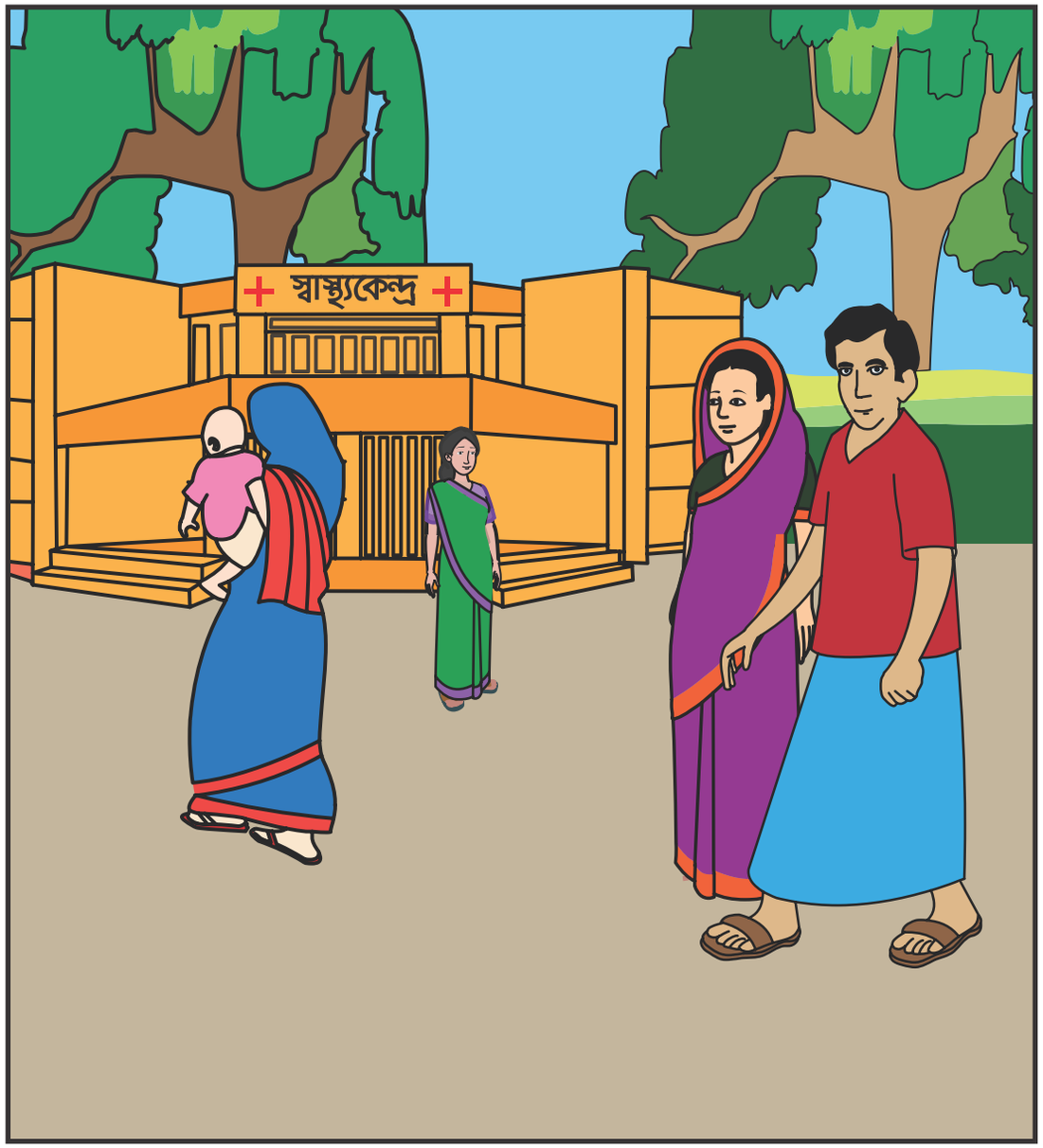

স্বামী তার গর্ভবতী স্ত্রীকে চেকআপের জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাচ্ছেন

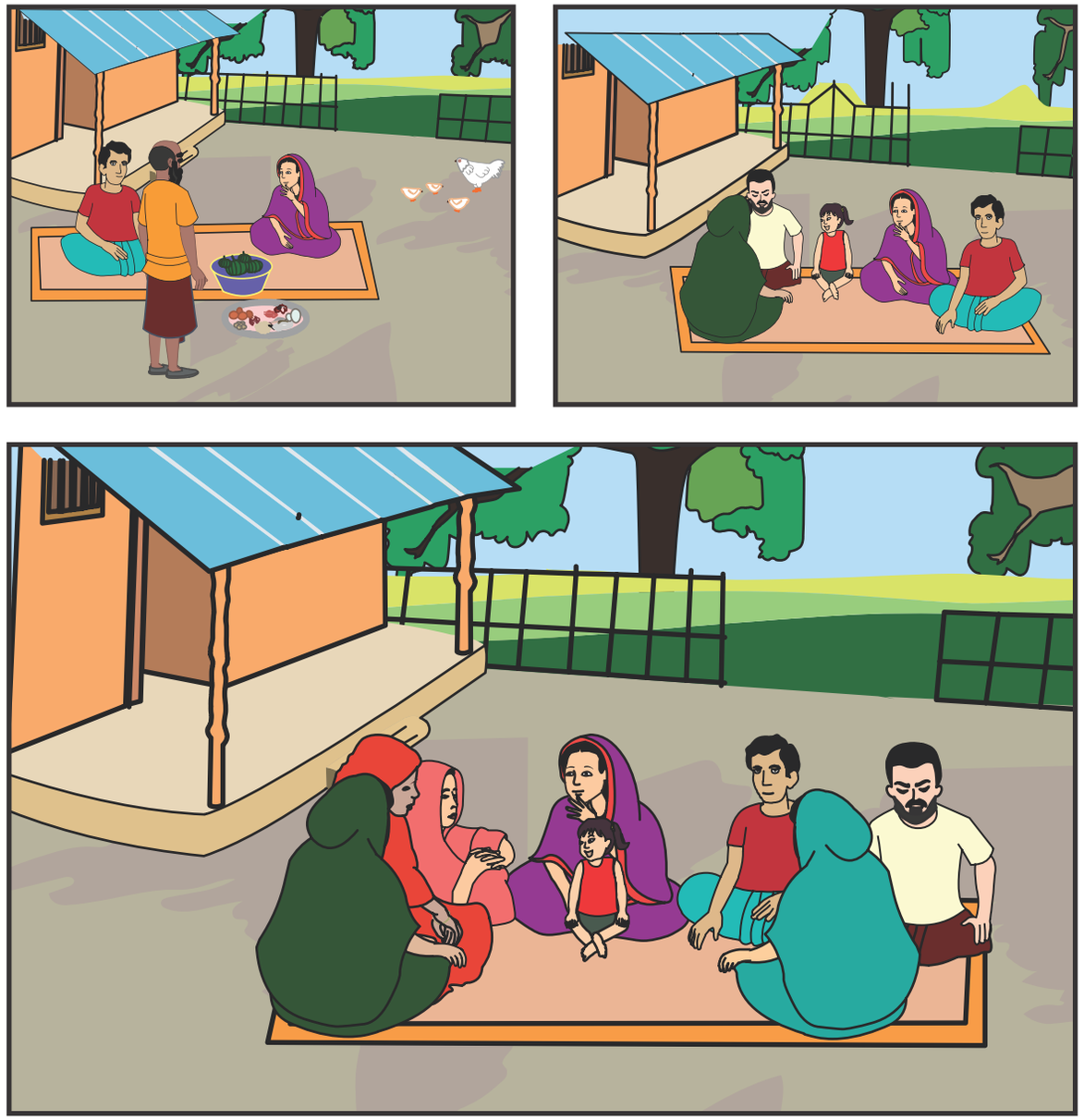

নারীর অংশগ্রহণে পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ

Reprinted with permission from Suchana, Save the Children

বিস্তারিত যোগাযোগ

ওয়ার্ল্ডফিশ বাংলাদেশ

বাড়ি ৩৩৫/এ, সড়ক ১১৪, গুলশান ২, ঢাকা ১২১২

ফোন: +৮৮০ ২ ৪১০৮ ০৩৭২, ৪১০৮ ০৬৭৩

www.worldfishcenter.org

প্রকাশনার তথ্যসূত্র:

এই প্রকাশনাটি ইউএসএআইডি'র অর্থায়নে ওয়ার্ল্ডফিশ বাস্তবায়িত এনহ্যান্সড কোস্টাল ফিশারিজ ইন বাংলাদেশ (ইকোফিশ-২) প্রকল্প কর্তৃক প্রস্তুতকৃত "নারীদের আয় ও পুষ্টি উন্নয়ন দলের (উইং) পুষ্টি শিক্ষা অধিবেশন পরিচালনা সহায়ক ফ্লিপচার্ট" যার সম্পাদক ছামিউল ইসলাম এবং প্রকাশ তারিখ আগষ্ট ২০২৩ হতে প্রাপ্ত তথ্য, উপাত্ত এবং ছবি ব্যবহার করে উন্নতকরণ করা হয়েছে।